লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

উদ্ভিদবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

প্রথম অধ্যায়

কোষ ও এর গঠন

CELL AND ITS STRUCTURE

প্রধান শব্দসমূহ : কোষ, ক্রোমোসোম, DNA, RNA, জিন, ট্রান্সক্রিপশন।

মাধ্যমিক পর্যায়ে উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষ, কোষের গঠন এবং বিভিন্ন অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ সম্বন্ধে তোমরা পড়েছ। এ অধ্যায়ে বিশেষ করে উদ্ভিদকোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুসমূহের অবস্থান, গঠন ও কাজ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. কোষ প্রাচীর ও প্লাজমামেমব্রেন এর অবস্থান, রাসায়নিক গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবে।
২. সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক প্রকৃতি এবং বিপাকীয় ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।
৩. রাইবোসোম, গলগিবস্তু, লাইসোজোম, সেন্ট্রিয়োল-এর অবস্থান, গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবে।
৪. গঠন ও কাজের ভিত্তিতে মসৃণ ও অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।
৫. মাইটোকন্ড্রিয়নের বহিঃগঠন ও অন্তঃগঠনের সাথে এর কাজের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. ক্লোরোপ্লাস্টের বহিঃগঠন ও অন্তঃগঠনের সাথে এর কাজের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭. নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৮. নিউক্লিওপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠনের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
৯. কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারবে।
১০. জীবের বিভিন্ন কার্যক্রমে কোষের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।
১১. ক্রোমোজোমের গঠন ও এর রাসায়নিক উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।
১২. কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
১৩. ডিএনএ ও আরএনএ গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৪. আরএনএ এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৫. ডিএনএ রেপ্লিকেশনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৬. ট্রান্সক্রিপশনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৭. ট্রান্সলেশন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৮. জিন ও জেনেটিক কোড বর্ণনা করতে পারবে।
১৯. বংশগতীয় বস্তু হিসেবে ডিএনএ এর অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।

Cell (সেল) নামকরণ : Robert Hooke (1635-1703) ১৬৬৫ সালে রয়েল সোসাইটি অব লন্ডন এর যন্ত্রপাতির রক্ষক নিযুক্ত হয়েই ভাবলেন আগামী সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত বিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সামনে একটা ভালো কিছু উপস্থাপন করতে হবে। তিনি ভাবলেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে একটা কিছু করা যায় কিনা। তিনি দেখলেন কাঠের ছিপি (cork) দেখতে নিরেট (solid) অথচ পানিতে ভাসে, এর কারণ কী? তিনি ছিপির একটি পাতলা সেকশন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি সেখানে মৌমাছির চাকের ন্যায় অসংখ্য ছোট ছোট কুঠুরী বা প্রকোষ্ঠ (little boxes) দেখতে পেলেন। তখন তাঁর মনে পড়লো আশ্রমে সন্ন্যাসীদের বা পাদ্রিদের থাকার জন্য এমন ছোট ছোট Cell (প্রকোষ্ঠ) তিনি দেখেছেন। এ থেকেই ছিপির little box গুলোকে তিনি নাম দেন **Cell বা প্রকোষ্ঠ**। ল্যাটিন *Cellula* থেকে Cell শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বা কুঠুরী। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ **Micrographia** গ্রন্থে প্রকাশ করেন। জেলখানায় কয়েদিদের জন্য নির্মিত ছোট ছোট প্রকোষ্ঠকেও সেল বলা হয়। অধিকাংশ কোষই আণুবীক্ষণিক, খালি চোখে দেখা যায় না। তবে এর কিছুটা ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। পাখির ডিম একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। হাঁস-মুরগির ডিম খালি চোখেই দেখা যায়। উটপাখির ডিম সবচেয়ে বড় কোষ (17 cm × 12.5 cm)। তুলা বা পাটের আঁশ, তালগাছের আঁশ বেশ লম্বা, খালি চোখে দেখা যায়। মানুষের নিউরন কোষ প্রায় 1.37 মিটার লম্বা। **Cell-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে কোষ বা জীবকোষ।** রবার্ট হুক প্রকৃতপক্ষে মৃত কোষ তথা কেবল প্রকোষ্ঠই দেখেছিলেন। পরে ডাচ বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ভ্যান

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, লক্ষ্য কর একটা ভালো কিছু করার ইচ্ছা ও চেষ্টা থেকেই কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব।

লিউয়েনহুক (Antony Van Leeuwenhoek) প্রথম ১৬৭৪ সালে কোষ প্রাচীর ছাড়াও ভেতরে পূর্ণাঙ্গ কোষীয় দ্রব্যসহ জীবিত কোষ পর্যবেক্ষণ করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী কোষের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

♣ **Jean Brachet** (1961) এর মতে- 'কোষ হলো জীবের গঠনগত মৌলিক একক।'

♣ **Loewy and Siekevitz** (1969) এর মতে- 'কোষ হলো জৈবিক ক্রিয়াকলাপের একক যা একটি অর্ধভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং যা অন্য কোনো সজীব মাধ্যম ছাড়াই আত্ম-জননে সক্ষম।'

♣ **De Roberties** (1979) এর মতে- 'কোষ হলো জীবের মৌলিক গঠনগত ও কার্যগত একক।'

প্রথম কোষের সৃষ্টি

১৮৮০ দশক থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় যে পূর্ব থেকে বিরাজমান কোষ থেকেই নতুন কোষের সৃষ্টি (Cells come from pre-existing cells)। কিন্তু বহুপূর্বে পৃথিবীতে কোনো কোষই ছিল না, তাহলে Pre-existing cell এলো কোথা হতে? প্রথম কোষ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল?

Alexander Oparin এবং J.B.S. Haldane (1920) বলেন যে আদিকালের বায়ুমণ্ডলে মিথেন (CH_3), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন (H_2) এবং পানি (জলীয় বাষ্প, H_2O) ছিল কিন্তু মুক্ত O_2 ছিল না। এসব গ্যাসসমূহের পরস্পর ঘর্ষণের ফলে কোনো জৈব অণু সৃষ্টি হয়েছে।

Stanley Miller এবং Harold Urey (1953) গবেষণাগারে উপরিউক্ত গ্যাসসমূহ একত্রে করে ইলেক্ট্রিক প্রবাহ প্রদানের ফলে অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হয়েছিল।

অনেকেই মনে করেন আদি জীবন সম্ভবত সরল RNA ছিল, যা থেকে পরে প্রোটিন তৈরি হয়েছিল। এই ধারণা RNA-World হাইপোথেসিস নামে পরিচিত।

বিষয়টি দাঁড়ায় নিম্নরূপ :

(i) প্রথম কোষ অবশ্যই জড় উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

(ii) লাইটেনিং-এর ফলে বায়ুমন্ডলে বিরাজমান CH_3, NH_3, H_2O ও H_2 থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হয়েছিল।

(iii) গভীর সমুদ্রে কার্বন যৌগ ও পলিমার সৃষ্টি হয়েছিল।

(iv) পরবর্তীতে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার তৈরি হয়েছিল।

(v) RNA-এর মাধ্যমে বংশগতির ধারা প্রবাহ শুরু হয়েছিল।

(vi) আদি কোষের DNA পরবর্তীতে কোষঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রকৃত নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়েছিল।

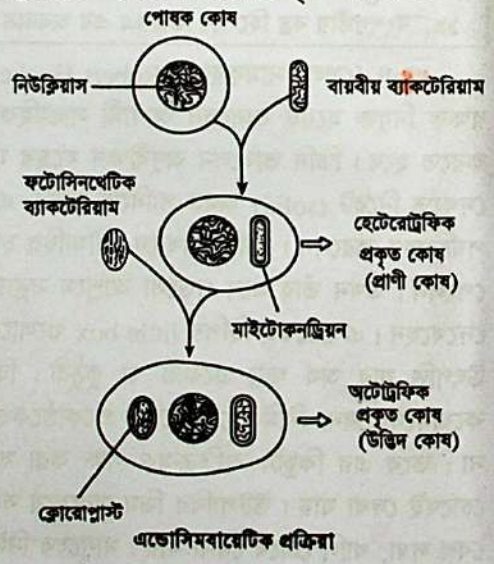

এছাড়া বর্তমানে বিরাজমান লক্ষ লক্ষ প্রজাতির কোটি কোটি জীব (সরল এককোষী থেকে জটিল বহুকোষী) একই জেনেটিক কোডন (৬৪ জেনেটিক কোডন) বহন করে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে সকল জীবের আদি উৎস প্রথম সৃষ্ট সেই আদি কোষ। আদি কোষ থেকে সৃষ্টি হয় প্রকৃত কোষ, সেই প্রকৃত কোষে একটি বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া ঢুকে পড়ে যা পরে মাইটোকন্ড্রিয়নে পরিণত হয় এবং সৃষ্টি হয় প্রকৃত প্রাণী কোষ। সেই প্রাণী কোষে ঢুকে পড়ে ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়াম যা পরে ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয় এবং সৃষ্টি হয় উদ্ভিদ কোষ। নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট একটি পোষক কোষে বায়বীয় ও ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে টিকে থাকার প্রক্রিয়াকে বলা হয় এন্ডোসিমবায়োসিস।

সেল (Cell) তথা কোষের বৈশিষ্ট্য

১। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গাঠনিক ও আণবিক উপাদান কোষে থাকে।

২। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভেতরে গ্রহণ করতে পারে।

৩। কাঁচামাল ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে পারে এবং নিজের প্রয়োজনীয় অণুগুলোকে সংশ্লেষ করতে পারে।

৪। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

৫। চারপাশের যে কোনো উত্তেজনার প্রতি সাড়া দিতে পারে।

৬। একটি Homeostatic অবস্থা (অর্থাৎ পরিবেশের অবস্থার তারতম্যের মাঝেও অভ্যন্তরীণ স্থিতি অবস্থা) বজায় রাখতে পারে।

৭। কাল পরিক্রমায় অভিযোজিত হতে পারে।

প্রতিটি জীবদেহ এক (এককোষী জীব) বা একাধিক (বহুকোষী জীব) কোষ দিয়ে গঠিত হয় অর্থাৎ **কোষই জীবদেহের গঠন একক**। আবার কোষের ভেতরই জীবের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জৈবিক কার্যকলাপ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ **জীবদেহের গঠন ও কাজের এককে কোষ বলে।**

কোষীয় অঙ্গাণু (Cell organelles): কোষের সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান জীবন্ত, কার্যসম্পাদনকারী ও কোষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য ক্ষুদ্রাঙ্গসমূহকে কোষীয় অঙ্গাণু বলে; যেমন-মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোসোম ইত্যাদি। অঙ্গাণু অর্থ ক্ষুদ্র অঙ্গ (organelles)।

এখানে ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট একটি প্রাণিকোষের লম্বচ্ছেদের চিত্র দেয়া হলো। চিত্রটি ভালোভাবে লক্ষ্য কর এবং পূর্বে আহরিত জ্ঞানের আলোকে পুনরায় এর গঠন ও বিভিন্ন অঙ্গাণুর অবস্থান ও বাহ্যিক গঠন মিলিয়ে নাও। ৭নং পৃষ্ঠায় দেয়া উদ্ভিদকোষের চিত্রটির সাথে মিলিয়ে এদের মধ্যকার পার্থক্য লিপিবদ্ধ কর।

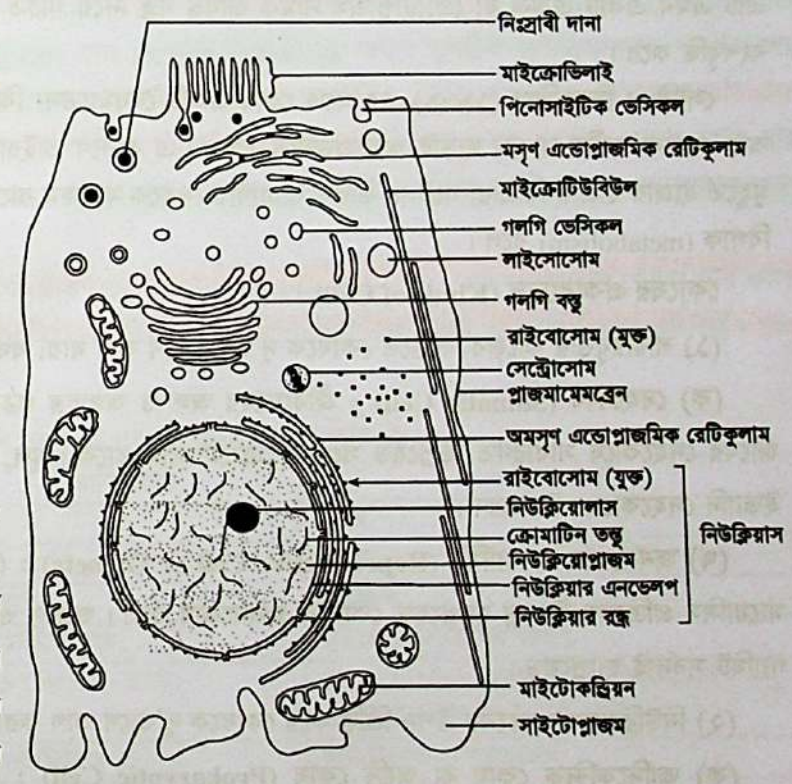

চিত্র ১.১ : একটি আদর্শ প্রাণিকোষ (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট)।

কোষবিদ্যা (Cytology) : জীববিদ্যার যে শাখায় কোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ কোষের প্রকার, অঙ্গাণুর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন, বিভাজন, বিকাশ, জৈবিক কার্যাবলি, বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে **কোষবিদ্যা বা সাইটোলজি (Cytology) বলে।** সাইটোলজি শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দের *Kytos* (= cell, ফাঁপা) এবং *logos* (= discourse, আলোচনা) সমন্বয়ে গঠিত। **Robert Hooke** (1635–1703) কে কোষবিদ্যার জনক বলা হয়। তবে আধুনিক কোষবিদ্যার জনক হলো **Carl P. Swanson** (1911–1996)।

কোষতত্ত্ব (Cell Theory) : কোষ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানার পর ১৮৩৮-১৮৩৯ সালে জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী **শ্লেইডেন** (Mathias Jakob Schleiden) ও প্রাণিবিজ্ঞানী **থিওডোর সোয়ান** (Theodor Schwann) এবং পরে ১৮৫৫ সালে **ভারচু** (Rudolf Virchow) **'কোষতত্ত্ব' প্রদান করেন,** যাতে বলা হয়–

১. কোষ হলো জীবন্ত সত্ত্বার গাঠনিক, শারীরবৃত্তীয় ও সাংগঠনিক একক।

২. কোষ হলো জীবনের মৌলিক একক।

৩. কোষ বংশগতির একক।

৪. সর্বপ্রকার জীবই এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত এবং পূর্বসৃষ্ট কোষ থেকেই নতুন কোষের সৃষ্টি হয়।

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে, জীবদেহ এক বা অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত এবং দেহের সকল কোষের কার্যাবলির সমন্বিত রূপই হলো জীবের কাজ। এজন্য জীবকোষকে জীবদেহের গঠন ও কার্যাবলির একক বলা হয়। জীবকোষের মৌলিক উপাদান ও গঠন অভিন্ন হলেও উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের মধ্যে যেমনি গঠনগত পার্থক্য রয়েছে তেমনি একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষের মধ্যেও আকার, আকৃতি, গঠন ও কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোষ জীবদেহের গাঠনিক একক। এটি এমন একটি একক যা প্রোটোপ্লাজম নামক জীবন্ত বস্তু দিয়ে গঠিত। অনুকূল পরিবেশে স্বাধীনভাবে টিকে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে।

লোয়ি ও সিকেভিজ (১৯৬৯)-এর মতে কোষ একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা সীমাবদ্ধ জীব কার্যকলাপের একক, যা অন্য কোনো সজীব মাধ্যম ছাড়াই আত্মপ্রজননে সক্ষম। এ কারণে ভাইরাস কোষের অন্তর্ভুক্ত নয়। কোষের ভেতরে প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার বিক্রিয়া ঘটে যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকে কর্মক্ষম রাখে। এ ধরনের বিক্রিয়াকে সম্মিলিতভাবে জীবের বিপাক (metabolism) বলে।

কোষের প্রকারভেদ (Kinds of Cell) :

(১) শারীরবৃত্তীয় কাজের ভিত্তিতে কোষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

(ক) দেহকোষ (Somatic Cell) : জীবদেহের অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র গঠনকারী কোষকে **দেহকোষ** বলে। উচ্চ শ্রেণির জীবের দেহকোষে সাধারণত ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। **মূল, কাণ্ড ও পাতার কোষ, স্নায়ু কোষ, রক্তকণিকা ইত্যাদি দেহকোষের উদাহরণ।**

(খ) জননকোষ বা গ্যামিট (Reproductive Cell or Gamete) : যৌন প্রজননের জন্য ডিপ্লয়েড জীবের জননাঙ্গে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হ্যাপ্লয়েড কোষকে **জননকোষ** বলে। **শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জননকোষের উদাহরণ। জননকোষ বা গ্যামিট সর্বদাই হ্যাপ্লয়েড।**

(২) নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে কোষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

(ক) আদিকেন্দ্রিক কোষ বা আদি কোষ (Prokaryotic Cell) : যে কোষে কোনো আবরণীবেষ্টিত নিউক্লিয়াস, এমনকি আবরণীবেষ্টিত (membrane-bound) অন্যকোনো অঙ্গাণুও (organelles) থাকে না তা হলো **আদি কোষ**। আদি কোষে নন-হিস্টোন প্রোটিনযুক্ত একটি মাত্র বৃত্তাকার DNA থাকে যা সাইটোপ্লাজমে মুক্তভাবে অবস্থান করে। **আদিকোষে বৃত্তাকার DNA যা মুক্তভাবে ছড়ানো থাকে তাকে নিউক্লিঅয়েড** (Nucleoid) বলে। **এদের রাইবোসোম 70S। আদি কোষ দ্বি-ভাজন বা অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। আদি কোষ দ্বারা গঠিত জীব হলো আদিকোষী জীব** (Prokaryotes)। **উদাহরণ-মাইকোপ্লাজমা, ব্যাকটেরিয়া** (*Escherichia coli* ও **সায়ানোব্যাকটেরিয়া** (BGA = Blue Green Algae)। **মনেরা রাজ্যের সব জীবই আদিকোষী।** [গ্রিক *Pro* = before, এবং *karyon* = nut, nucleus অর্থাৎ নিউক্লিয়াস সংগঠনের আগের অবস্থা] **আদিকোষে অবাত শ্বসন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোষণ পদ্ধতিতে পুষ্টি ঘটে। কতক ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে।**

কাজ : উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের পোস্টার তৈরি।
উপকরণ : পোস্টার পেপার, পেন্সিল, রং পেন্সিল, ইরেজার, উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের চিত্র।
কার্যপদ্ধতি : বড় পোস্টার পেপার নিতে হবে। পেপারে লম্বভাবে পাশাপাশি দু'টি কোষের জন্য স্থান নির্ধারণ করতে হবে। প্রথমে পেন্সিল দিয়ে হালকাভাবে চিত্র দু'টি এঁকে নিতে হবে, প্রয়োজনে ইরেজার দিয়ে মুছে আবার আঁকতে হবে। আঁকা চূড়ান্ত হলে রং পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অংশ চিহ্নিত করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে হবে। চূড়ান্তকরণের আগে অবশ্যই শিক্ষককে দেখিয়ে নিতে হবে।

(খ) **প্রকৃতকেন্দ্রিক কোষ বা প্রকৃত কোষ (Eukaryotic Cell) :** যে কোষে আবরণীবেষ্টিত নিউক্লিয়াস থাকে তা হলো প্রকৃত কোষ। প্রকৃত কোষে নিউক্লিয়াস ছাড়াও আবরণীবেষ্টিত অন্যান্য অঙ্গাণু (যেমন- মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, গলগিবস্তু, লাইসোসোম প্রভৃতি) থাকে। দুই স্তরবিশিষ্ট একটি আবরণী (নিউক্লিয়ার এনভেলপ) দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় নিউক্লিয়োপ্লাজম, নিউক্লিয়োলাস এবং একাধিক ক্রোমোসোম নিয়ে নিউক্লিয়াস গঠিত। প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোম লম্বা (বৃত্তাকার নয়), দুই প্রান্তবিশিষ্ট এবং DNA ও হিস্টোন-প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। এদের রাইবোসোম 80S, DNA সূত্রাকার এবং একাধিক ক্রোমোসোমে অবস্থিত; কোষ বিভাজন মাইটোসিস ও মায়োসিস প্রকৃতির। Eukaryotic শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ গ্রিক *eu* = good; এবং *karyon* = nucleus অর্থাৎ সুগঠিত নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ। জড় কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট প্রকৃত কোষই প্রকৃত উদ্ভিদকোষ। শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইট্স, জিমনোস্পার্মস এবং অ্যানজিওস্পার্মস ইত্যাদি সব উদ্ভিদই প্রকৃত কোষ দিয়ে গঠিত এবং সকল প্রাণিকোষ প্রকৃত কোষ। প্রকৃত কোষ দ্বারা গঠিত জীব হলো প্রকৃতকোষী জীব (Eukaryotes). প্রকৃত কোষে সবাত শ্বসন ঘটে। শোষণ, আত্তিকরণ ও সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে পুষ্টি ঘটে।

সম্ভবত: প্রথম প্রকৃতকোষী এবং বহুকোষী জীব হলো *Bongiomorpha pubescens* নামক লোহিত শৈবাল যার ফসিল ১২০০ মিলিয়ন বছরের পূর্বের শিলা থেকে আবিস্কৃত হয়েছে। বড় স্ত্রীগ্যামিট এবং ছোট পুংগ্যামিট দ্বারা এর যৌন জনন হতো।

আদি কোষ ও প্রকৃত কোষের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	আদি কোষ	প্রকৃত কোষ
১। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন	নেই	আছে
২। সুগঠিত নিউক্লিয়াস	নেই	আছে
৩। DNA	বৃত্তাকার	সূত্রাকার
৪। সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু	শুধু রাইবোসোম	রাইবোসোমসহ সব অঙ্গাণু
৫। রাইবোসোমের ধরন	70 S (50 S + 30 S)	80 S (60 S + 40 S) তবে ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়াতে 70 S পাওয়া যায়।
৬। কোষ বিভাজন	অ্যামাইটোসিস	মাইটোসিস ও মায়োসিস
৭। শ্বসন	অবাত শ্বসন ঘটে	সবাত শ্বসন ঘটে

কাজ : শিক্ষক, শিক্ষার্থীদেরকে কমপক্ষে দু'টি দলে ভাগ করে দিবেন। শিক্ষার্থীগণ আদি কোষ ও প্রকৃত কোষের পার্থক্য পাশাপাশি ছকে লিখবেন। দুই দলের তৈরিকৃত ছকের ওপর ভিত্তি করে শেষ দশ মিনিট শিক্ষক একটি চূড়ান্ত ছক তৈরি করে দিবেন। ছক তৈরিকালে কোষের নিউক্লিয়ার বৈশিষ্ট্য, রাইবোসোম, অন্যান্য অঙ্গাণু, DNA, কোষবিভাজন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

(৩) প্রকৃতকোষী জীবদেহে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের ভিত্তিতে উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের গঠন এক হলেও এদের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। এজন্য উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ দুটি আলাদা বৈশিষ্ট্যের কোষ।

(ক) উদ্ভিদকোষ : কোষের বাইরে শক্ত, সেলুলোজ নির্মিত কোষ প্রাচীর থাকে। পরিণত কোষে কেন্দ্রে বড় কোষ গহ্বর ও সাইটোপ্লাজমে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। পরিণত কোষের গঠন সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার হয়ে থাকে। সঞ্চিত খাদ্য শ্বেতসার (starch)। সাধারণত সেন্ট্রোসোম থাকে না।

(খ) প্রাণিকোষ : এদের কোষে কোষ প্রাচীর থাকে না এবং কোষ গহ্বর অনুপস্থিত, থাকলেও অতি ক্ষুদ্রাকৃতির, ক্লোরোপ্লাস্ট অনুপস্থিত। কোষে সেন্ট্রোসোম থাকে। সঞ্চিত খাদ্য চর্বি ও গ্লাইকোজেন।

কোষ পরিমাপের বিভিন্ন একক

অধিকাংশ উদ্ভিদ কোষ খালি চোখে দেখা যায় না। এদের দেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সাধারণত কোষ এবং কোষের উপাংশগুলোর পরিমাপের জন্য যে এককটি ব্যবহার করা হয় তা হলো μm (মাইক্রোমিটার) বা μ (মাইক্রন) এবং nm (ন্যানোমিটার)। নিম্নে কোষ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন একক ও এদের ব্যবহার দেয়া হলো।

একক	সংকেত	মান	ব্যবহার
১। সেন্টিমিটার	1 cm	= 0.4 inch	খালি চোখে দেখা যায় (যেমন ডিম) এমন কোষ।
২। মিলিমিটার	1mm	= 0.1 cm	খালি চোখে দৃশ্যমান, তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় এমন কোষ।
৩। মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন	1μm/1μ	= 0.001 mm	আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় তেমন বেশির ভাগ কোষ ও উপাংশসমূহ।
৪। ন্যানোমিটার	1nm	= 0.001 μm	ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন কোষ উপাংশসমূহ।
৫। অ্যাংস্ট্রম	1Å	= 0.1 nm	ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এক্সরে প্রক্রিয়ায় দেখা যায় এমন কোষ উপাংশসমূহ।

কোষের আয়তন : কোষের কোনো সুনির্দিষ্ট আয়তন নেই। অধিকাংশ কোষই আণুবীক্ষণিক। সবচেয়ে ছোট কোষ হলো- Mycoplasma যার অপর নাম PPLO (Pleuro Pneumonia Like Organism) এবং বড় কোষ হলো উটপাখির ডিম (17 cm × 12.5 cm)। মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা কোষ হলো- মটর নিউরন যা প্রায় 1.37 মিটার লম্বা এবং স্পাইনাল কর্ডের গোড়া থেকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেহের একটি সাধারণ কোষের আকার প্রায় 10 μm (মাইক্রোমিটার) এবং ওজন 1 ng (ন্যানোগ্রাম)।

একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের গঠন

সব উদ্ভিদ যেমন একই রকম নয়, সব উদ্ভিদকোষও একই রকম নয়। এমনকি একটি বহুকোষী উদ্ভিদের বিভিন্ন টিস্যুর কোষও ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। কাজেই কোনো একটি নির্দিষ্ট কোষে, কোষের সব গঠন উপাদান ও ক্ষুদ্রাঙ্গ নাও থাকতে পারে। বর্ণনার সুবিধার্থে তাই একটি কোষে সব উপাদান ও ক্ষুদ্রাঙ্গের উপস্থিতি ধরে নেয়া হয়, যাকে বলা হয় আদর্শ উদ্ভিদকোষ। একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ প্রধানত নিম্নলিখিত অঙ্গ ও অঙ্গাণু নিয়ে গঠিত।

১। কোষ প্রাচীর, ২। কোষঝিল্লি, ৩। সাইটোপ্লাজম (এতে থাকে প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোসোম, গলগি বডি, লাইসোসোম, সেন্ট্রোসোম, গ্লাইঅক্সিজোম, মাইক্রোট্রিউবিউলস ইত্যাদি ক্ষুদ্রাঙ্গ এবং কোষগহ্বর), **৪। নিউক্লিয়াস** (এতে আছে নিউক্লিয়ার এনভেলপ, নিউক্লিয়োপ্লাজম, নিউক্লিয়োলাস ও ক্রোমোসোম) এবং **৫। কোষস্থ নির্জীব বস্তু** (সঞ্চিত খাদ্য, নিঃসৃত পদার্থ এবং বর্জ্য পদার্থ)। একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের অংশসমূহকে নিম্নে উপস্থাপিত ছকের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে।

- **আদর্শ উদ্ভিদকোষ**
  - **জড় বস্তু (পদার্থ)**
    - **কোষ প্রাচীর**
    - **কোষস্থ নির্জীব (জড়) বস্তু**
      - **সঞ্চিত পদার্থ**
        - ▶কার্বোহাইড্রেট
        - ▶প্রোটিন
        - ▶লিপিড
      - **নিঃসৃত পদার্থ**
        - ▶হরমোন
        - ▶পিগমেন্ট
        - ▶এনজাইম
        - ▶নেকটার ইত্যাদি
      - **বর্জ্য পদার্থ**
        - ▶রেজিন
        - ▶ট্যানিন
        - ▶গাম (আঠা)
        - ▶ল্যাটেক্স
        - ▶অ্যালকালয়েড
        - ▶জৈব অ্যাসিড
        - ▶উদ্বায়ী তেল
        - ▶খনিজ পদার্থ
  - **প্রোটোপ্লাজম (কোষস্থ সজীব বস্তু)**
    - **কোষঝিল্লি**
    - **সাইটোপ্লাজম**
      - **সাইটোমাতৃকা (সাইটোসোল)**
      - **কোষীয় অঙ্গাণু**
        - ▶প্লাস্টিড
        - ▶মাইটোকন্ড্রিয়া
        - ▶এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম
        - ▶রাইবোসোম
        - ▶গলগি বডি
        - ▶লাইসোসোম
        - ▶সেন্ট্রোসোম
        - ▶কোষীয় কঙ্কাল বা সাইটোস্কেলিটন
        - ▶পারঅক্সিসোম
        - ▶ গ্লাইঅক্সিসোম
        - ▶কোষ গহ্বর
    - **নিউক্লিয়াস**
      - ▶নিউক্লিয়ার এনভেলপ
      - ▶নিউক্লিয়োপ্লাজম
      - ▶নিউক্লিয়োলাস
      - ▶নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমোসোম

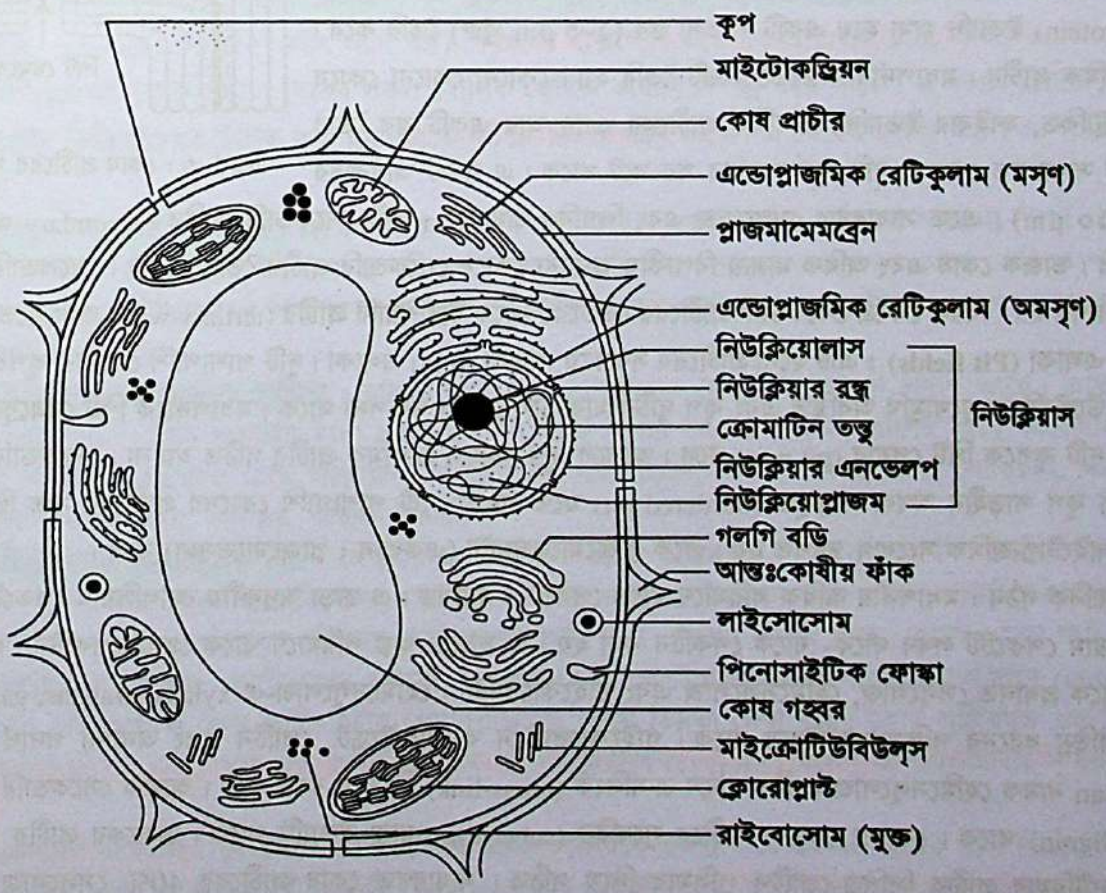

চিত্র ১.২ : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের দ্বিমাত্রিক গঠন ও চিহ্নিত চিত্র।

১.১ কোষ প্রাচীর (Cell Wall)

প্রতিটি উদ্ভিদকোষ একটি অপেক্ষাকৃত শক্ত জড় আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। এ জড় ও শক্ত আবরণকে কোষ প্রাচীর বলে। রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে কোষ দেখেছিলেন তা ছিল মূলত কোষ প্রাচীর। কোষ প্রাচীর উদ্ভিদকোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদ কোষে মধ্য পর্দা এবং কোষঝিল্লির মাঝখানে জড় কোষ প্রাচীরের অবস্থান। ছত্রাকেও কোষ প্রাচীর আছে। এক কোষী উদ্ভিদ বা ব্যাকটেরিয়াতে কোষঝিল্লির বাইরে জড় প্রাচীরের অবস্থান।

ভৌত গঠন : একটি বিকশিত কোষ প্রাচীরকে প্রধানত তিনটি ভিন্ন স্তরে (layers) বিভক্ত দেখা যায়। এর প্রথম স্তরটি হলো **মধ্যপর্দা** (middle lamella)। মাইটোটিক কোষ বিভাজনের টেলোফেজ (telophase) পর্যায়ে এর সূচনা ঘটে। সাইটোপ্লাজম থেকে আসা ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট (phragmoplast) এবং গলগি বডি থেকে আসা পেকটিন জাতীয় ভেসিকলস্ (vesicles or droplets) মিলিতভাবে মধ্যপর্দা সৃষ্টি করে। পেকটিক অ্যাসিড বেশি থাকার কারণে এটি প্রথম দিকে জেলির মতো থাকে। কোষ প্রাচীরের যে স্তরটি দুটি পাশাপাশি কোষের মধ্যবর্তী সাধারণ পর্দা হিসেবে অবস্থান করে তার নাম মধ্যপর্দা। এটি বিগলিত হয়ে গেলে দুটি কোষ পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তরটি হলো **প্রাথমিক প্রাচীর** (primary wall)। মধ্যপর্দার ওপর সেলুলোজ (cellulose), হেমিসেলুলোজ (hemicellulose) এবং গ্লাইকোপ্রোটিন (glycoprotein) ইত্যাদি জমা হয়ে একটি পাতলা স্তর (১-৩ μm পুরু) তৈরি করে। এটি প্রাথমিক প্রাচীর। মধ্যপর্দার অন্তঃতলে এটি তৈরি হয়। কোনো কোনো কোষে (যেমন- ট্রাকিড, ফাইবার ইত্যাদি) প্রাথমিক প্রাচীরের ওপর আর একটি স্তর তৈরি হয়। এটি সাধারণত কোষের বৃদ্ধি পূর্ণাঙ্গ হবার পর ঘটে থাকে। এ স্তরটি অধিকতর পুরু (৫-১০ μm)। এতে সাধারণত সেলুলোজ এবং লিগনিন জমা হয়। এটি **সেকেন্ডারি প্রাচীর** (secondary wall) বা তৃতীয় স্তর। ভাজক কোষ এবং অধিক মাত্রায় বিপাকীয় অন্যান্য কোষে সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি হয় না। সেকেন্ডারি প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট হয়। বিরল ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি প্রাচীরের ভেতরের দিকে **টারশিয়ারি প্রাচীর** (tertiary wall) জমা হতে পারে।

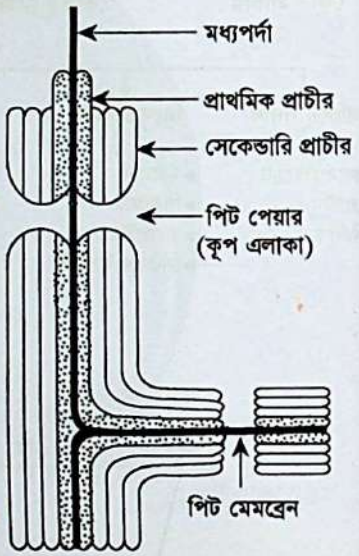

চিত্র ১.৩ : কোষ প্রাচীরের গঠন।

কূপ এলাকা (Pit fields) : এটি হলো প্রাচীরের সবচেয়ে পাতলা (thin) এলাকা। দুটি পাশাপাশি কোষের কূপও একটি অপরটির উল্টোদিকে মুখোমুখি অবস্থিত এবং কূপ দুটির মাঝখানে কেবল মধ্যপর্দা থাকে। মধ্যপর্দাকে **পিট মেমব্রেন** বলে। মুখোমুখি দুটি কূপকে **পিট পেয়ার** (pit pair) বলে। আসলে কূপ অঞ্চলে প্রাথমিক প্রাচীর গঠিত হয় না। সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি হলে কূপ পাড়হীন অথবা পাড়যুক্ত (bordered pit) হতে পারে। দুটি পাশাপাশি কোষের প্রাচীরের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে নলাকার সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ স্থাপিত হয়। একে **প্লাজমোডেসমাটা** (একবচন : প্লাজমোডেসমা) বলে।

রাসায়নিক গঠন : মধ্যপর্দায় অধিক পরিমাণে থাকে পেকটিক অ্যাসিড। এ ছাড়া অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম পেকটেট এবং ম্যাগনেসিয়াম পেকটেট লবণ থাকে- যাকে পেকটিন বলা হয়। এ ছাড়াও অল্প পরিমাণে থাকে প্রোটোপেকটিন। প্রাথমিক প্রাচীরে থাকে প্রধানত সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ এবং গ্লাইকোপ্রোটিন। হেমিসেলুলোজ-এ xylans, arabans, galactans ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পলিস্যাকারাইডস থাকে। গ্লাইকোপ্রোটিনে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং অন্যান্য পদার্থ থাকে। Xyloglucan নামক হেমিসেলুলোজ প্রাচীর গঠনে ক্রসলিংক (cross-link) হিসেবে কাজ করে। অনেক সেকেন্ডারি প্রাচীরে লিগনিন (lignin) থাকে। কোনো কোনো প্রাচীরে সুবেরিন (suberin), ওয়াক্স ইত্যাদি থাকে। ছত্রাকের প্রাচীর কাইটিন এবং ব্যাকটেরিয়ার প্রাচীর লিপিড-প্রোটিন পলিমার দিয়ে গঠিত। সাধারণত কোষ প্রাচীরের 40% সেলুলোজ, 20% হেমিসেলুলোজ, 30% পেকটিন ও 10% গ্লাইকোপ্রোটিন বিদ্যমান।

সূক্ষ্ম গঠন (Ultra-structure) : কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ। সেলুলোজ হলো একটি পলিস্যাকারাইড যা ৬-কার্বনবিশিষ্ট β-D গ্লুকোজের অসংখ্য অণু নিয়ে গঠিত। ১ হাজার থেকে ৩ হাজার সেলুলোজ অণু নিয়ে একটি সেলুলোজ চেইন গঠিত হয়। প্রায় ১০০ সেলুলোজ চেইন মিলিতভাবে একটি ক্রিস্টালাইন মাইসেলি (micelle) গঠন করে। মাইসেলিকে কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক ধরা হয়। প্রায় ২০টি মাইসেলি মিলে একটি মাইক্রোফাইব্রিল (microfibril) গঠন করে এবং ২৫০টি মাইক্রোফাইব্রিল মিলিতভাবে একটি ম্যাক্রোফাইব্রিল (macrofibril) গঠন করে। অনেকগুলো ম্যাক্রোফাইব্রিল মিলিতভাবে একটি তন্তু (ফাইবার) গঠন করে।

কোষ প্রাচীরের কাজ : (i) কোষের সুনির্দিষ্ট আকৃতি দান করা; (ii) বাইরের আঘাত হতে ভেতরের সজীব বস্তুকে রক্ষা করা; (iii) প্রয়োজনীয় শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান করা; (iv) পানি ও খনিজ লবণ শোষণ ও পরিবহনে সহায়তা করা এবং (v) এক কোষকে অন্য কোষ হতে পৃথক করা। প্রাণিকোষে কোষ প্রাচীর থাকে না।

প্রোটোপ্লাস্ট (Protoplast)

কোষ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত সমুদয় পদার্থ একসাথে প্রোটোপ্লাস্ট নামে পরিচিত। উদ্ভিদকোষ, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকে জড় কোষ প্রাচীরের নিচেই প্রোটোপ্লাস্টের অবস্থান। প্রোটোপ্লাস্ট দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- সজীব প্রোটোপ্লাজম ও নির্জীব বস্তু বা অপ্রোটোপ্লাজমীয় উপাদান। নিম্নে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) : কোষের অভ্যন্তরে স্বচ্ছ, আঠালো এবং জেলির ন্যায় অর্ধতরল, কলয়ডালধর্মী সজীব পদার্থকে প্রোটোপ্লাজম বলে। প্রোটোপ্লাজম শব্দটি ১৮৪০ সনে বিজ্ঞানী পার্কিনজে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। (Gk. *proto*=আদি, *plasma* = সংগঠন অর্থাৎ আদি বস্তু)। বিজ্ঞানী হাক্সলে-র মতে প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে জীবনের ভৌত ভিত্তি। কারণ প্রোটোপ্লাজমই কোষের তথা দেহের সকল মৌলিক জৈবিক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। এ জন্যই প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে ৭০%–৯০% পানি থাকে। এ থেকেই বোঝা যায় কেন পানির অপর নাম জীবন।

প্রোটোপ্লাজমের ভৌত বৈশিষ্ট্য : (i) প্রোটোপ্লাজম অর্ধস্বচ্ছ, বর্ণহীন, জেলি সদৃশ অর্ধতরল আঠালো পদার্থ। (ii) এটি দানাদার ও কলয়ডালধর্মী। (iii) ইহা কোষস্থ পরিবেশ অনুযায়ী জেলি থেকে তরলে এবং তরল থেকে জেলিতে পরিবর্তিত হতে পারে। (iv) প্রোটোপ্লাজমের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানি অপেক্ষা বেশি। (v) উত্তাপ, অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের প্রভাবে প্রোটোপ্লাজম জমাট বাঁধে।

প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য : রাসায়নিকভাবে প্রোটোপ্লাজমে জৈব এবং অজৈব পদার্থ আছে। এতে অধিক পরিমাণে আছে পানি। জৈব পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, এরপর আছে কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড ও ভিটামিন। এছাড়াও আছে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, কপার, জিঙ্ক, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, আয়রন ইত্যাদি।

প্রোটোপ্লাজমের জৈবিক বৈশিষ্ট্য : প্রোটোপ্লাজম বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনায় সাড়া দেয়। খাদ্য তৈরি, খাদ্য হজম, আত্তীকরণ, শ্বসন, বৃদ্ধি, জনন ইত্যাদি সকল মেটাবলিক কার্যকলাপ প্রোটোপ্লাজম করে থাকে। প্রোটোপ্লাজমের জৈবিক বৈশিষ্ট্যই জীবের বৈশিষ্ট্য। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজম পানি গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে। এদেরও মৃত্যু ঘটে।

প্রোটোপ্লাজমের চলন : প্রোটোপ্লাজম কখনো স্থির থাকে না। প্রোটোপ্লাজমের এ গতিময়তাকে চলন (movement) বলে। কোষ প্রাচীরযুক্ত ও কোষ প্রাচীরবিহীন প্রোটোপ্লাজমের চলনে ভিন্নতা দেখা যায়। কোষ প্রাচীরযুক্ত প্রোটোপ্লাজমে জলস্রোতের মতো যে চলন দেখা যায় তাকে আবর্তন বা সাইক্লোসিস (cyclosis) বলে। আবর্তন আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে।

(i) একমুখী আবর্তন : যে চলনে প্রোটোপ্লাজম একটি গহ্বরকে কেন্দ্র করে কোষপ্রাচীরের পাশ দিয়ে নির্দিষ্ট পথে একদিকে ঘুরতে থাকে তাকে একমুখী আবর্তন (rotation) বলে। যেমন- পাতা ঝাঁঝির কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের চলন।

(ii) বহুমুখী আবর্তন : যে চলনে প্রোটোপ্লাজম কতগুলো গহ্বরকে কেন্দ্র করে অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন দিকে ঘুরতে থাকে তখন তাকে বহুমুখী আবর্তন (circulation) বলে। যেমন- *Tradescantia*-র কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের চলন।

প্রোটোপ্লাজমের প্রধান অংশসমূহ : প্লাজমামেমব্রেন বা কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস– এ তিনটি হলো প্রেটোপ্লাজমের প্রধান অংশ।

১.২ প্লাজমামেমব্রেন বা কোষঝিল্লি (Cell membrane)

কোষ প্রাচীরের ঠিক নিচে সমস্ত প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি সজীব ঝিল্লি আছে। এ ঝিল্লিকে কোষঝিল্লি বলে। অন্যভাবে, প্রতিটি সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজম যে সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক, বৈষম্যভেদ্য, লিপো-প্রোটিন দ্বারা গঠিত সজীব দ্বিস্তরী ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে, তাকে প্লাজমামেমব্রেন বা কোষঝিল্লি বলে। একে প্লাজমালেমা, সাইটোমেমব্রেন এসব নামেও অভিহিত করা হয়। কার্ল নাগেলি (Carl Nageli ও Cramer, 1855) সর্বপ্রথম এই ঝিল্লিকে প্লাজমামেমব্রেন নামকরণ করেন। তবে বর্তমানে অনেকেই একে বায়োমেমব্রেন (biomembrane) বলতে চান। J. Q. Plower (1931) প্লাজমালেমা শব্দটি ব্যবহার করেন। ঝিল্লিটি স্থানে স্থানে ভাঁজবিশিষ্ট হতে পারে। প্রতিটি ভাঁজকে মাইক্রোভিলাস (বহুবচনে মাইক্রোভিলাই) বলে। কোষাভ্যন্তরে অধিক প্রবিষ্ট মাইক্রোভিলাসকে বলা হয় পিনোসাইটিক ফোস্কা। প্রাণিকোষে এসব ভালো দেখা যায়।

ভৌত গঠন (Physical Structure) : কোষঝিল্লির ভৌত গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Danielli & Davson (1935) সর্বপ্রথম একটি সুনির্দিষ্ট মডেল প্রস্তাব করেন। এটি Sandwitch মডেল নামে পরিচিত। তাঁদের মতে ঝিল্লিটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট এবং প্রতি স্তরে প্রোটিন (monomolecular) এবং লিপিড (bimolecular) উপ-স্তর আছে। দ্বিস্তরবিশিষ্ট ঝিল্লির ওপর ও নিচে প্রোটিন স্তর এবং মাঝখানে লিপিড স্তর অবস্থিত।

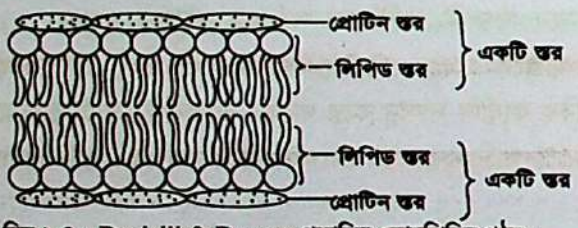

চিত্র ১.৪ : Danielli & Davson প্রস্তাবিত কোষঝিল্লির গঠন।

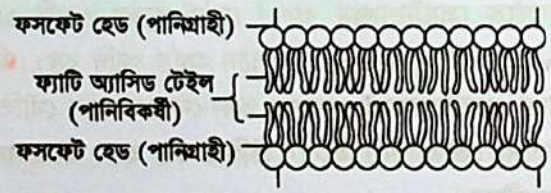

চিত্র ১.৫ : ফসফোলিপিড বাইলেয়ার।

এছাড়াও প্লাজমামেমব্রেন বা কোষঝিল্লির গঠন সম্বন্ধে Benson's model (1966), Lenard & Singer's model (1966), Robertson এর Unit membrane hypothesis (1959), Singer & Nicolson (1972) এর Fluid-mosaic model ইত্যাদি মডেল প্রস্তাবিত হয়েছে।

ইউনিট মেমব্রেন (Unit membrane) : বিজ্ঞানী রবার্টসন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্লাজমামেমব্রেনের ইউনিট মেমব্রেন মতবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে– সব বায়োলজিক্যাল মেমব্রেনের আণবিক গঠন একই প্রকার অর্থাৎ ফসফোলিপিড বাইলেয়ার দিয়ে গঠিত যার স্থানে স্থানে প্রোটিন গ্রোথিত থাকে। স্থানে স্থানে গ্রোথিত প্রোটিনসহ ফসফোলিপিড বাইলেয়ারকে কখনো কখনো ইউনিট মেমব্রেন বলা হয়।

ফ্লুইড-মোজাইক মডেল (Fluid -mosaic model)

বিভিন্ন মডেলের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণীয় মডেল হলো ফ্লুইড-মোজাইক মডেল (S.J. Singer and G.L. Nicolson-1972)। প্লাজমামেমব্রেন এর গঠন সংক্রান্ত ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এস. জে. সিঙ্গার এবং জি. এল. নিকলসন কর্তৃক প্রবর্তিত মডেলকে ফ্লুইড-মোজাইক মডেল বলে। এ মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লি দ্বিস্তরবিশিষ্ট। প্রতিটি স্তর ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত (চিত্র ১.৬)। উভয় স্তরের হাইড্রোকার্বন লেজটি সামনাসামনি (মুখোমুখী) থাকে এবং পানিগ্রাহী (hydrophillic) মেরু অংশ বিপরীত দিকে থাকে। ঝিল্লির প্রোটিন অণুগুলো ফসফোলিপিড স্তরে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে। কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য উপাদানও ফসফোলিপিড মাধ্যমে এখানে সেখানে মিশে থাকতে পারে। লিপিড অণুর মধ্যে প্রোটিনের এরূপ বিন্যাসকে সিঙ্গার ও নিকলসন সমুদ্রতলে ভাসমান হিমশৈল (Iceberg) এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সদৃশগত কারণে এ মডেলকে আইসবার্গ মডেলও বলা হয়।

ফ্লুইড-মোজাইক মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লির গাঠনিক উপাদান নিম্নরূপ :

(ক) ফসফোলিপিড বাইলেয়ার : এটি দুই স্তরবিশিষ্ট এবং ফসফোলিপিড (অণু) দিয়ে তৈরি। প্রতিটি ফসফোলিপিডে এক অণু গ্লিসারল থাকে এবং গ্লিসারলের সাথে দুটি ননপোলার ফ্যাটি অ্যাসিড লেজ এবং একটি পোলার ফসফেট হেড থাকে। ফসফেট হেড ও ফ্যাটি অ্যাসিড লেজের মাঝে গ্রিসারল থাকে।

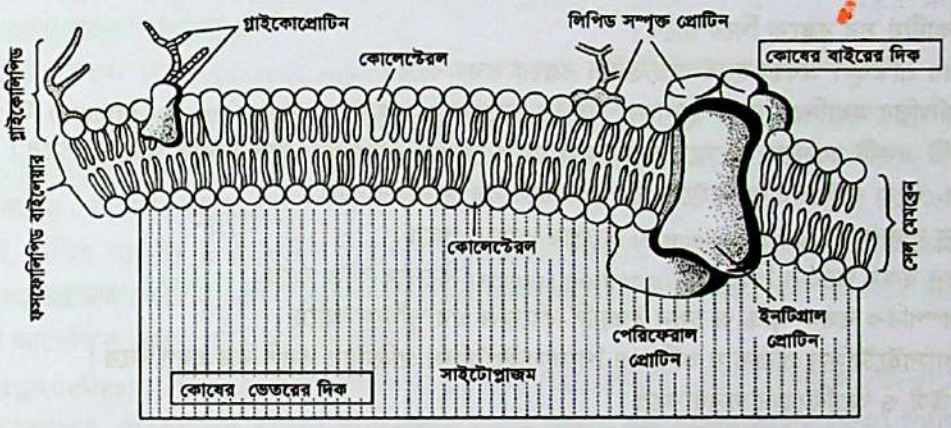

চিত্র ১.৬ : ফ্লুইড-মোজাইক মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লির গঠন।

(খ) মেমব্রেন প্রোটিন : কোষঝিল্লিতে তিন ধরনের প্রোটিন শনাক্ত করা হয়েছে। যেমন : (i) ইনটিগ্রাল প্রোটিন-এগুলো ঝিল্লির উভয় সার্ফেস পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। (ii) পেরিফেরাল প্রোটিন-এগুলো ঝিল্লির সার্ফেসে থাকে এবং (iii) লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন-এগুলো লিপিড কোর-এ সম্পৃক্ত থাকে। মেমব্রেনে অবস্থিত প্রোটিনই মেমব্রেন প্রোটিন।

(গ) গ্লাইকোক্যালিক্স : এটি ঝিল্লির ওপর একটি চিনির স্তর বিশেষ। ফসফোলিপিড অণুর সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে গ্লাইকোলিপিড ও প্রোটিন অণুর সাথে কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে গ্লাইকোপ্রোটিন গঠন করে। গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোলিপিডকে মিলিতভাবে গ্লাইকোক্যালিক্স বলা হয়। কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খলগুলো সবসময় ঝিল্লির বহিঃস্তরে অবস্থান করে।

(ঘ) কোলেস্টেরল : এটি লিপিড জাতীয় পদার্থ। ফসফোলিপিড অণুর ফাঁকে ফাঁকে এগুলো অবস্থান করে। প্রাণি কোষের ঝিল্লিতে এটি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। সেল সার্ফেস (cell surfaces)-এ ভেদ্যতা (permeability) ও এনজাইমের কার্যকারিতা পরিবর্তনশীল হতে দেখা যায়। এতে বোঝা যায়, সার্ফেস এলাকা এবং এর উপাদান উভয়ই পরিবর্তনযোগ্য। ফ্লুইড-মোজাইক মডেল অনুযায়ী এসব পরিবর্তনশীলতা ঘটা সম্ভব। এ মডেল অনুযায়ী প্রোটিন এবং গঠন উপাদানসমূহকে স্থির (fixed) ধরা হয় না, বরং মনে করা হয় এরা ফসফোলিপিডে ভেসে থাকে। ফলে বস্তুর একটি মোজাইক তৈরি হয়। প্রোটিনসমূহ আংশিক পানিগ্রাহী (hydrophilic-যখন ঝিল্লির সার্ফেস-এ থাকে) এবং আংশিক পানিরোধী (hydrophobic-যখন লিপিডের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় মাঝের দিকে থাকে) হতে পারে। এ মডেল কোষঝিল্লির কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন হতে উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্যাদির (protein derivatives) উপস্থিতি সমর্থন করে। কতিপয় বস্তু কোষের ভেতর হতে বাইরে বের করতে এবং বাইর হতে ভেতরে প্রবেশ করাতে কোষঝিল্লির কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে কোষঝিল্লিটি অনেকটা তরল পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। লিপিড অণু তরল পদার্থের ন্যায় ঝিল্লির একই স্তরে স্থান পরিবর্তন করে, পাশে ব্যাপ্ত (diffuse) হয় এবং অক্ষের (long axis) বরাবর ঘুরতে (rotate) পারে। একে **flip-flop movement** বলে। এ তথ্যগুলো ফ্লুইড-মোজাইক মডেলকে বিশেষভাবে সমর্থন করে।

কোষঝিল্লির রাসায়নিক উপাদান : (i) কোষঝিল্লিতে থাকে প্রোটিন (৬০–৮০%), লিপিড (২০–৪০%), এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলিস্যাকারাইড (polysaccharides) (৪–৫%)। (ii) প্রোটিন গাঠনিক উপাদান হিসেবে (structural), এনজাইম হিসেবে (enzymes) এবং বাহক প্রোটিন (carrier protein) হিসেবে থাকে। এদের গঠন ও পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে। (iii) কোষঝিল্লির মোট শুষ্ক ওজনের প্রায় ৭৫ ভাগই লিপিড। লিপিড প্রধানত

ফসফোলিপিড (phospholipids) হিসেবে থাকে। ইতোমধ্যেই পাঁচ রকম ফসফোলিপিড শনাক্ত করা হয়েছে-যার সবচেয়ে সরলটি হলো ফসফোটাইডিক অ্যাসিড এবং অন্য চারটি জটিল প্রকৃতির (complex)। জটিল ফসফোলিপিডের মধ্যে লেসিথিন (lecithin) প্রধান। ঝিল্লিস্থ ফসফোলিপিডের অর্ধেকের বেশি থাকে লেসিথিন। (iv) কোনো কোনো ক্ষেত্রে RNA (পিঁয়াজের কোষে) থাকতে পারে।

কোষঝিল্লির কাজ :

(i) এটি কোষীয় সব বস্তুকে ঘিরে রাখে।
(ii) বাইরের প্রতিকূল অবস্থা হতে অভ্যন্তরীণ বস্তুকে রক্ষা করে।
(iii) কোষঝিল্লির মধ্যদিয়ে বস্তুর স্থানান্তর, ব্যাপন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় (control and coordinate) হয়।
(iv) ঝিল্লিটি একটি কাঠামো হিসেবে কাজ করে যাতে বিশেষ এনজাইম এতে বিন্যস্ত থাকতে পারে।
(v) ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরে বস্তু স্থানান্তর করে।
(vi) বিভিন্ন বৃহদাণু (macro-molecule) সংশ্লেষ করতে পারে।
(vii) বিভিন্ন রকম তথ্যের ভিত্তি (information source) হিসেবে কাজ করে।
(viii) পারস্পরিক বন্ধন, বৃদ্ধি ও চলন ইত্যাদি কাজেও এর ভূমিকা আছে।
(ix) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কঠিন ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তরল বস্তু গ্রহণ করে।
(x) এনজাইম ও অ্যান্টিজেন ক্ষরণ করে।
(xi) কোষের বাইরে থেকে নিউরোট্রান্সমিটার, হরমোন ইত্যাদি রূপে তথ্য সংগ্রহ করে।
(xii) স্নায়ু উদ্দীপনা সংবহন করে।

কোষঝিল্লির বিভিন্ন অবস্থা

(i) মাইক্রোভিলাই : অন্ত্রের এপিথেলিয়াম কোষের মুক্ত প্রান্তের কোষঝিল্লি অন্ত্রগহ্বরে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতির অভিক্ষেপ তৈরি করে। মাইক্রোভিলাই নামে পরিচিত এ অভিক্ষেপগুলোর সংখ্যা প্রতিকোষে ৩,০০০ পর্যন্ত হতে পারে। মাইক্রোভিলাই-এর কাজ হলো কোষের শোষণ অঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি করা।

(ii) ডেসমোসোম : কোষঝিল্লির কোনো কোনো স্থানে টনোফাইব্রিল নামক অসংখ্য ফিলামেন্টযুক্ত বৃত্তাকার অঞ্চল দেখা যায়। টনোফাইব্রিলসহ ঐ বৃত্তাকার অঞ্চলকে ডেসমোসোম বলে।

(iii) ফ্যাগোসাইটিক ভেসিকল : কঠিন খাদ্যকণাকে আবৃত করে যে গহ্বর সৃষ্টি করে তাকে ফ্যাগোসাইটিক ভেসিকল এবং এ প্রক্রিয়াকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে।

(iv) পিনোসাইটিক ভেসিকল : কোষঝিল্লির কোনো স্থানে ফাটল সৃষ্টি হলে উক্ত ফাটল স্থান দিয়ে পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থ গড়িয়ে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে পিনোসাইটিক ভেসিকল সৃষ্টি করে এবং এ প্রক্রিয়াকে পিনোসাইটোসিস বলে।

কোষ প্রাচীর ও কোষঝিল্লির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	কোষ প্রাচীর	কোষঝিল্লি / প্লাজমামেমব্রেন
১। সজীবতা	কোষ প্রাচীর নির্জীব তথা জড়।	কোষঝিল্লি সজীব।
২। অবস্থান	কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য, কোষঝিল্লির বাইরে অবস্থিত।	কোষঝিল্লি উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় প্রকার কোষে থাকে।
৩। গঠন	প্রধানত সেলুলোজ নির্মিত জড়, শক্ত, ভেদ্য প্রাচীরযুক্ত।	প্রধানত প্রোটিন ও লিপিড সমন্বয়ে গঠিত জীবন্ত, স্থিতিস্থাপক ও অর্ধভেদ্য পর্দাযুক্ত।
৪। কাজ	প্রধান কাজ হলো কোষের আকার-আকৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং কোষকে দৃঢ়তা প্রদান।	প্রধান কাজ হলো কোষের ভেতর-বাইরে প্রয়োজনীয় বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমীয় অংশ সংরক্ষণ।
৫। অলংকরণ	গৌণস্তরের বিশেষ বিন্যাসের জন্য নানাবিধ অলংকরণ দেখা যায়।	কোনোরূপ অলংকরণ দেখা যায় না।

কাজ : কোষ প্রাচীর ও প্লাজমামেমব্রেনের মধ্যকার পার্থক্যগুলো পাশাপাশি একটি ছকে উপস্থাপন করতে হবে। পার্থক্য নির্ণয়কালে এদের অবস্থান, গঠন, স্তরায়ন, অলংকরণ, সজীবতা ও কাজ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

১.৩ সাইটোপ্লাজম ও অঙ্গাণু (Cytoplasm and Organelles)

নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষঝিল্লি দিয়ে পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমীয় অংশের নামই হলো **সাইটোপ্লাজম**। এটি মাতৃকা ও অঙ্গাণু অংশ নিয়ে গঠিত।

সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা (Cytoplasmic matrix) : মাতৃকা হলো সাইটোপ্লাজমের ভিত্তি পদার্থ।

ভৌত গঠন : মাতৃকা হলো একটি অর্ধতরল, দানাদার, অর্ধস্বচ্ছ, সমধর্মী, কলয়ডাল তরল পদার্থ। একে হায়ালোপ্লাজমও বলা হয়। বর্তমানে একে সাইটোসোল (Cytosol) বলা হয়। **A. H. Lardy** (1965) প্রথম সাইটোসোল শব্দটি ব্যবহার করেন। সাইটোপ্লাজমে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৩৬টি বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ, বিভিন্ন অ্যাসিড ও এনজাইম বিদ্যমান। সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকার অপেক্ষাকৃত ঘন, কম দানাদার বহিস্থ শক্ত অঞ্চলকে **এক্টোপ্লাজম** (কর্টেক্স, প্লাজমাজেল) বলে এবং কেন্দ্রস্থ অপেক্ষাকৃত কম ঘন অঞ্চলকে **এন্ডোপ্লাজম** বলে। সাইটোপ্লাজমের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানি অপেক্ষা বেশি।

অঙ্গাণু (Organelles) : সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকায় প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোসোম, গলগি বডি, লাইসোসোম, সেন্ট্রোসোম, মাইক্রোটিউবিউলস প্রভৃতি ক্ষুদ্রাঙ্গ এবং বিভিন্ন নির্জীব (জড়) পদার্থও থাকে।

সাইটোপ্লাজমের কাজ : (i) বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ধারণ করা (ii) কতিপয় জৈবিক কাজ করা (iii) কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করা (iv) রেচন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে সাহায্য করা (v) উত্তেজনায় সাড়া দেয়া এবং (vi) পানি পরিশোষণে সাহায্য করা। (vii) আবর্তনের Cyclosis) মাধ্যমে অঙ্গাণুগুলোকে নড়াচড়ায় সাহায্য করা। সাইটোপ্লাজমের ভেতর কোষ গহ্বরের চারদিকে অত্যন্ত পাতলা পর্দার আকারে অবস্থিত সাইটোপ্লাজমীয় পর্দাটির নাম **টনোপ্লাস্ট**।

সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক উপাদান ও প্রকৃতি (Chemical nature of cytoplasm)

সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক উপাদানকে **অজৈব** (inorganic) এবং **জৈব** (organic)– এ দু' শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। অজৈব উপাদানের মধ্যে প্রধান হলো পানি ও পানিতে দ্রবীভূত গ্যাস। এছাড়াও আছে বিভিন্ন খনিজ বস্তু, আয়ন। জৈব উপাদানের মধ্যে আছে কার্বোহাইড্রেট, জৈব অ্যাসিড, লিপিড, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, হরমোন, ভিটামিন, বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ। সাইটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ কোষভেদে ৬৫–৯৬%। সাইটোপ্লাজমের প্রকৃতি অর্ধতরল, দানাদার, অর্ধস্বচ্ছ, সমধর্মী ও কলয়ডাল।

সাইটোপ্লাজমের বিপাকীয় ভূমিকা (Metabolic role of cytoplasm): যে কোনো জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়া বিক্রিয়া চলতে থাকে। এর অধিকাংশই সাইটোপ্লাজম নির্ভর। বিপাকীয় ক্রিয়াগুলোর কতক সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়, কতক সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুগুলোতে সংঘটিত হয়। জীবের জন্য সবচেয়ে বড় শারীরবৃত্তীয় কাজ হলো শ্বসন। শ্বসনের প্রথম পর্যায় তথা গ্লাইকোলাইসিস সংঘটিত হয় সাইটোপ্লাজমে। এছাড়া সাইটোপ্লাজম হলো বিভিন্ন এনজাইমের আধার, আর সকল জৈবিক ক্রিয়া বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম। কাজেই পরোক্ষভাবে জীবের সকল বিপাকীয় কাজের নিয়ন্ত্রকও সাইটোপ্লাজম।

প্রোটোপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পার্থক্য

প্রোটোপ্লাজম	সাইটোপ্লাজম
১। কোষের সমুদয় সজীব অংশকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজম জীবনের ভৌত ভিত্তি।	১। নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষঝিল্লি দিয়ে পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমের অংশ হলো সাইটোপ্লাজম।
২। প্রোটোপ্লাজম কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস এই তিন অংশে বিভেদিত।	২। সাইটোপ্লাজম দুটি অংশে বিভক্ত, যথা-সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু ও মাতৃকা।
৩। প্রোটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসযুক্ত, তাই বংশগতির ধারক ও বাহক।	৩। সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসবিহীন, তাই বংশগতির ধারক ও বাহক নয়।
৪। জীবনের আধার হিসেবে কাজ করে।	৪। কতিপয় অঙ্গাণুর আধার হিসেবে কাজ করে।

সাইটোপ্লাজমে বিরাজমান অঙ্গাণুসমূহ

কোষের সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত ঝিল্লিযুক্ত ও ঝিল্লিবিহীন যেসব ক্ষুদ্র অংশগুলো বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে তাদের **সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু** বা **কোষীয় অঙ্গাণু** বলে। সাইটোপ্লাজমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু বিরাজ করে। নিচে সাইটোপ্লাজমের প্রধান প্রধান অঙ্গাণুর বিবরণ উপস্থাপন করা হলো :

১। রাইবোসোম (Ribosome)

সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় বিরাজমান অথবা অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকার গায়ে অবস্থিত যে দানাদার কণায় প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে তাই **রাইবোসোম**। রাইবোসোম অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং প্রায় গোলাকার। সাধারণত অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উভয় দিকে এরা সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত থাকে। সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায়ও রাইবোসোম থাকে। মুক্ত রাইবোসোম আদি কোষের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মুক্ত রাইবোসোমের কোনো আবরণী নাই। সাইটোপ্লাজমে একাধিক রাইবোসোম মুক্তোর মালার মতো অবস্থান করলে তাকে পলিরাইবোসোম বা পলিসোম বলে।

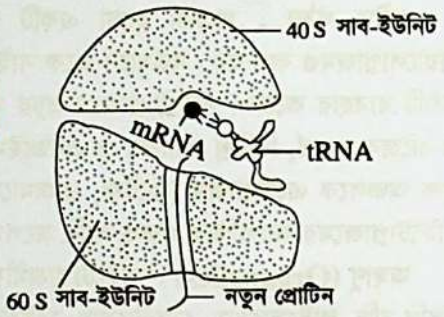

চিত্র ১.৭ : রাইবোসোম : দুই সাব-ইউনিট এবং mRNA ও tRNA এর সম্ভাব্য অবস্থান দেখানো হয়েছে।

আবিষ্কার : অ্যালবার্ট ক্লড (Albert Claude, 1899-1983) নামক একজন বিজ্ঞানী ১৯৫৪ সালে যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমকে সেন্ট্রিফিউজ করে RNA সমৃদ্ধ ৬০০-২০০০ Å (৬০—২০০ nm) ব্যাসবিশিষ্ট বহু ক্ষুদ্রকণা পৃথক করেন এবং নাম দেন **মাইক্রোসোম**। এরপর রোমানিয়ান কোষ বিজ্ঞানী **জর্জ প্যালেড** (George Palade) ১৯৫৫ সালে কোষের ভারী পদার্থরূপে **রাইবোসোম** আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে ইলেক্ট্রন আণুবীক্ষণিক চিত্রে মাইক্রোসোমের দুটি অংশ পৃথকযোগ্য দেখা যায়, একটি হলো অন্তঃপ্লাজমীয় ঝিল্লি এবং অপরটি হলো ক্ষুদ্রাকার কণা। এ কণাকেই পরবর্তীতে **রাইবোসোম** নাম দেয়া হয়। ১৯৫৮ সালে **রিচার্ড রবার্টস** (Richard B. Roberts) রাইবোসোম নামকরণ করেন। ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং নিউক্লিয়োপ্লাজমে **রাইবোনিউক্লিয়ো-প্রোটিন কণা** (Ribonucleo-protein particle-**RNP**) নামক ক্ষুদ্রাকার রাইবোসোম আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রকারভেদ : আকার ও সেডিমেন্টেশন সহগ (কো-এফিসিয়েন্ট) হিসেবে রাইবোসোম মূলত 70 S এবং 80 S এই দুই প্রকার। 70 S রাইবোসোম (আণবিক ওজন 2.7×10^6 ডাল্টন) থাকে আদিকোষী জীবে। আর 80 S রাইবোসোম (আণবিক ওজন 40×10^6 ডাল্টন) থাকে প্রকৃতকোষী জীবে। 70 S রাইবোসোম, 50 S এবং 30 S এই দুই সাব-ইউনিটে বিভক্ত থাকে। 80 S রাইবোসোম, 60 S এবং 40.S এই দুই সাব-ইউনিটে বিভক্ত থাকে। প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় আদি কোষে 50 S ও 30 S সাব-ইউনিট একত্রিত হয়ে 70 S একক গঠন করে এবং প্রকৃত কোষে 60 S ও 40 S সাব-ইউনিট একত্রিত হয়ে 80 S একক গঠন করে। [কোনো বস্তুকে সেন্ট্রিফিউজ করলে তলায় তার অধঃক্ষেপ জমা হয়। সেন্ট্রিফিউজ করা কালে বিভিন্ন ভরসম্পন্ন বস্তুর অধঃক্ষেপণের হারকে S দিয়ে বোঝানো হয়। S= Svedberg unit = ভেদবার্গ একক; সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের দ্রুত ঘূর্ণন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ভরসম্পন্ন বস্তুর অধঃক্ষেপণের হারকে ভেদবার্গ একক বলে। সুইডিস প্রাণরসায়নবিদ Theodor Svedberg এর নামের প্রথম অক্ষর S দিয়ে তা বোঝানো হয়ে থাকে।]

আকৃতি ও ভৌত গঠন : এরা মূলত বৃত্তাকার তবে ত্রিকোণ এবং পঞ্চকোণ বিশিষ্ট বলেও অনেকে দাবি করেছেন। এটি চওড়ায় ২২ nm এবং উচ্চতায় ২০ nm। রাইবোসোম প্রধানত বহু প্রকার প্রোটিন ও rRNA দিয়ে তৈরি। *E. coli* কোষের শুষ্ক ওজনের প্রায় ২২ ভাগই রাইবোসোম। রাইবোসোমের বহু প্রোটিন মূলত এনজাইম।

mRNA অণু রাইবোসোমের সাথে যুক্ত হলে tRNA-র সহায়তায় এমিনো অ্যাসিড দিয়ে পলিপেপটাইড তথা প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় রাইবোসোমে সাব-ইউনিটগুলো পৃথক থাকে। কেবলমাত্র প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় এরা একত্রিত হয়। এ সময় রাইবোসোমে ৪টি স্থান লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলো অ্যামাইনোঅ্যাসাইল বা A স্থান, পেপটাইডিল বা P

স্থান, নির্গমন বা E স্থান এবং mRNA সংযুক্তি স্থান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুইয়ের অধিক রাইবোসোম একটি mRNA সূত্র দ্বারা সংযুক্ত হয়ে পলিরাইবোসোম গঠন করে।

রাসায়নিক গঠন : রাইবোসোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রোটিন ও RNA। এদের অনুপাত প্রায় ১ ঃ ১। 70 S রাইবোসোমে রয়েছে 23 S, 16 S ও 5 S মানের ৩টি rRNA অণু এবং ৫২ প্রকারের প্রোটিন অণু। অপরদিকে 80 S রাইবোসোমে রয়েছে 28 S, 18 S, 5.8 S ও 5 S মানের ৪টি rRNA অণু এবং ৮০ প্রকারের প্রোটিন অণু। এছাড়া এতে অল্প পরিমাণে ধাতব আয়ন, যেমন-Mg^{++}, Ca^{++} ও Mn^{++} ইত্যাদি থাকে।

[আদি কোষের রাইবোসোম রাসায়নিকভাবে পৃথক ধরনের, তাই টেট্রাসাইক্লিন বা স্ট্রেপ্টোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষ বন্ধ করে দিয়ে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে কিন্তু মানবদেহের প্রোটিন সংশ্লেষণে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।]

উৎপত্তি : আদি কোষে DNA (আদি ক্রোমোসোম) থেকে উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রকৃত কোষে সাব-ইউনিট দু'টি পৃথকভাবে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে তৈরি হয় এবং পরে সাইটোপ্লাজমে চলে আসে। পলিপেপটাইড তৈরি শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সাব-ইউনিট পৃথক থাকে।

রাইবোসোমের কাজ : রাইবোসোমের প্রধান কাজ হলো প্রোটিন সংশ্লেষণ (তৈরি) করা। তাই রাইবোসোমকে কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয়। প্রোটিন সংশ্লেষণের শুরুতে mRNA আদি কোষের 30 S এবং প্রকৃত কোষের 40 S সাব-ইউনিটের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এরপর আদি কোষে 30 S এর সাথে 50 S মিলে 70 S একক গঠন করে এবং প্রকৃত কোষে 40 S এর সাথে 60 S সাব-ইউনিট এসে একত্রিত হয়ে 80 S একক গঠন করে এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ শুরু হয়। এরা সাইটোক্রোম উৎপন্ন করে যারা কোষীয় শ্বসনে ইলেকট্রন পরিবহন করে। গ্লুকোজের ফসফোরাইলেশন এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থের বিপাক রাইবোসোমে সংঘটিত হয়।

২। গলগি বডি (Golgi body)

নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অবস্থিত এবং দ্বিস্তরবিশিষ্ট ঝিল্লি দ্বারা আবদ্ধ ছোট নালিকা, ফোস্কা, চৌবাচ্চা বা ল্যামেলির ন্যায় সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুর নাম গলগি বডি (গলগি যন্ত্র বা গলগি ক্ষেত্র)। গলগি বডি চেপ্টা, গোলাকার বা লম্বা হতে পারে। এরা সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি একত্রিত হয়ে অবস্থান করে। ইতালীয় স্নায়ুতত্ত্ববিদ ক্যামিলো গলগি (Camillo Golgi, 1843-1926) ১৮৯৮ সালে প্রথম পেঁচা ও বিড়ালের স্নায়ুকোষে এটি দেখতে পান এবং তাঁর নামানুসারে পরবর্তীকালে এ অঙ্গাণুর নাম রাখা হয়েছে গলগি বডি। মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে গলডি বডি সৃষ্টি হয়। এদেরকে ডিকটায়োসোম (dictaosome), ইডিওসোম (Idiosome) বা লাইপোকন্ড্রিয়া (lypochondria) নামেও অভিহিত করা হয়। প্রায় সব প্রাণী কোষেই এরা বিদ্যমান। গলগি বডিতে ফ্যাটিঅ্যাসিড, ভিটামিন-কে, বিভিন্ন প্রকার এনজাইম (ATPase, ADPase, ট্রান্সফারেজ ইত্যাদি) থাকে। কখনো ক্যারটিনয়েডও থাকে। গলগি বডিকে 'কোষের ট্রাফিক পুলিশ' (Traffic Police of Cell) বলা হয়। কারণ গলগিবডি কোষের কেন্দ্রীয় অংশ থেকে ঝিল্লিবদ্ধ বস্তু (ভেসিকল) কোষের পরিধির দিকে প্লাজমামেমব্রেন পর্যন্ত নিয়ে যায়।

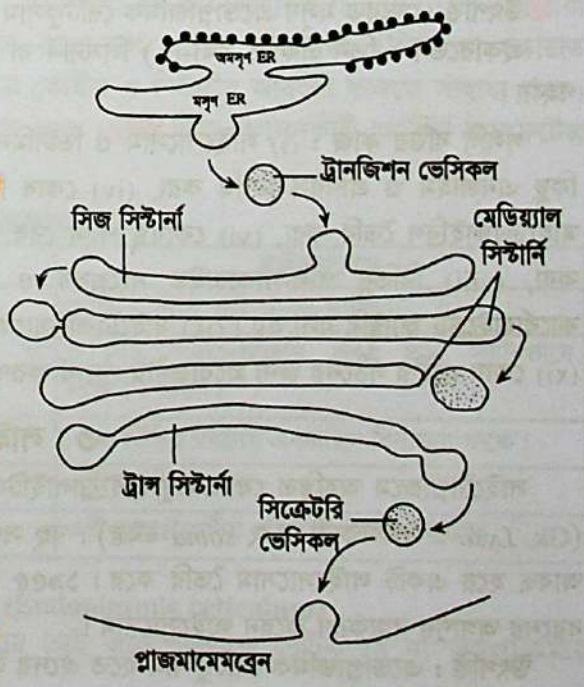

চিত্র ১.৮ : গলগি বডি।

ভৌত গঠন : গলগি যন্ত্রের কতগুলো চ্যাপ্টা থলে বা চৌবাচ্চা আকৃতির গঠনসমূহকে সিস্টার্নি (এক বচনে-সিস্টার্না) বলে এবং কিছুটা অনিয়মিত নালিকা ও ভেসিকলসমূহকে ট্রান্স-গলগি নেটওয়ার্ক (Trans-Golgi Network-TGN) বলে।

সিস্টার্নি একসাথে গাদা করে (stack) থাকে। প্রতিটি স্বতন্ত্র গাদাকে (stack) বলা হয় **গলগি বডি বা ডিকটায়োসোম** (dictyosome)। গলগি যন্ত্রের প্লাজমামেমব্রেনের কাছাকাছি অংশকে বলা হয় **ট্রান্স-ফেইস** (trans-face)। আর কোষের কেন্দ্রের দিকের অংশকে বলা হয় **সিজ-ফেইস** (cis-face)। ট্রান্সফেইস-এর শেষ সিস্টার্নাকে বলা হয় **ট্রান্সসিস্টার্না** (transcisterna) এবং সিজ-ফেইসের শেষ সিস্টার্নাকে বলা হয় **সিজ-সিস্টার্না** (cis-cisterna), মধ্যভাগের গুলোকে বলা হয় **মেডিয়্যাল সিস্টার্নি** (medial cisternae)। সিস্টার্নির পার্শ্বদেশে অবস্থিত গোলাকার বৃহৎ তলের মতো গঠনগুলোকে ভ্যাকুওল বলে। সবগুলো সংগঠন ইন্টারসিস্টার্নাল বস্তু দিয়ে একসাথে সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে। তিন অংশে তিন ধরনের এনজাইম থাকে এবং এদের কাজও তিন ধরনের।

প্রাণিকোষে সাধারণত গলগিযন্ত্র কোষের এক জায়গায় একসাথে অবস্থান করে কিন্তু উদ্ভিদকোষে দৃশ্যত পৃথক পৃথক শতাধিক গলগি বডি সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে থাকে।

উদ্ভিদ কোষে গলগি বডির প্রধান কাজ হলো গ্লাইকোপ্রোটিনের অলিগোস্যাকারাইড-এ পার্শ্ব শৃঙ্খল সংযুক্ত করা এবং জটিল পলিস্যাকারাইড সংশ্লেষ ও নিঃসরণ করা। তাই উদ্ভিদ কোষে গলগি বডিকে **কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি** বলা হয়। উদ্ভিদ কোষে গলগি বডির আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো কোষ প্রাচীর গঠন করা।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে উৎপাদিত দ্রব্যাদির ঝিল্লিবদ্ধ ভেসিকল (ট্রানজিশন ভেসিকল) সিজ-সিস্টার্না গ্রহণ করে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে মেডিয়্যাল সিস্টার্নির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ট্রান্সসিস্টার্না হয়ে কোষে অন্যত্র বা প্লাজমামেমব্রেনে চলে যায়।

রাসায়নিক গঠন : গলগি বডি আবরণীতে ৬০ ভাগ প্রোটিন এবং ৪০ ভাগ লিপিড থাকে। এছাড়া এতে ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন-K ও ক্যারোটিনয়েড থাকে। বিভিন্ন ধরনের এনজাইম দ্বারা এদের থলিগুলো পূর্ণ থাকে। গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমগুলো হলো – ADPase, ATPase, CTPase, TTPase

উৎপত্তি : সম্ভবত মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে উৎপত্তি হয়।

প্রকারভেদ : তিন প্রকার; যথা-(১) সিস্টার্নি বা চ্যাপ্টা থলি, (২) ভেসিকল বা ছোট গহ্বর, (৩) ভ্যাকুওল বা বড় গহ্বর।

গলগি বডির কাজ : (i) লাইসোসোম ও ভিটামিন তৈরি করা। (ii) অ-প্রোটিন জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষণ করা, (iii) কিছু এনজাইম ও প্রাণরস নির্গম করা, (iv) কোষ বিভাজনকালে কোষপ্লেট তৈরি করা, (v) প্রোটিন, হেমিসেলুলোজ, মাইক্রোফাইব্রিল তৈরি করা, (vi) কোষস্থ পানি বের করা, (vii) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি ঝিল্লিবদ্ধ করা, (viii) বিভিন্ন পলিস্যাকারাইড সংশ্লেষণ ও পরিবহনে অংশগ্রহণ করা। তাই উদ্ভিদ কোষে গলগি বডিকে **কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি** বলা হয়। (ix) মাইটোকন্ড্রিয়াকে ATP উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা। (x) প্রোটিন ও Vit-C সঞ্চয় করা। (xi) কোষ প্রাচীর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ ক্ষরণ করা।

৩। লাইসোসোম (Lysosome)

সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত যে অঙ্গাণু হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের আধার হিসেবে কাজ করে তাকে **লাইসোসোম** বলে (Gk. *Lyso* = হজমকারী এবং *soma* =বস্তু)। বহু সংখ্যক নানাবিধ হাইড্রোলাইটিক এনজাইম **একটি দ্বিস্তরী ঝিল্লি** দ্বারা আবদ্ধ হয়ে একটি লাইসোসোম তৈরি করে। ১৯৫৫ সালে **ক্রিশ্চিয়ান দ্য দ্যুঁবে** (Christain de Duve, 1917-2013) এ ধরনের অঙ্গাণুর নামকরণ করেন লাইসোসোম।

উৎপত্তি : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে এদের উৎপত্তি এবং গলগি বডি কর্তৃক প্যাকেজকৃত।

বিস্তৃতি : প্রাণিদেহের শ্বেত রক্তকণিকা কোষে অধিক সংখ্যায় লাইসোসোম দেখা যায়। **প্রায় সব প্রাণিকোষে,** বিশেষ করে বৃক্ক কোষ, অন্ত্রের আবরণী কোষেও লাইসোসোম আছে। RBC-তে লাইসোসোম থাকে না। **সম্প্রতি উদ্ভিদকোষেও লাইসোসোমের ন্যায় spherosome আবিস্কৃত হয়েছে। এদেরকে oleosome-ও বলা হয়।** এরা আকারে ছোট। **তৈল জাতীয় পদার্থ ঝিল্লিবদ্ধ করা এদের প্রধান কাজ। Oleosome-এর ঝিল্লি একস্তরবিশিষ্ট বলে জানা যায়।**

ভৌত গঠন : লাইসোসোম সাধারণত বৃত্তাকার, এদের ব্যাস সাধারণত ০.২-০.৮ মাইক্রোমিলি। বৃক্ক কোষের লাইসোসোম অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে থাকে। প্রতিটি লাইসোসোম একটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এদের ভ্যাকুওল ঘন তরলে পূর্ণ থাকে।

কতক বস্তু লাইসোসোমের ঝিল্লিকে স্থিতি দান করে যার ফলে লাইসোসোম থেকে এনজাইমসমূহ বের হয়ে আসতে পারে না। এদেরকে বলা হয় লাইসোসোম *stabilizer*। কতক বস্তু লাইসোসোমের ঝিল্লি বিদীর্ণ হতে সাহায্য করে যার ফলে এ এনজাইমসমূহ বের হয়ে এসে অটোলাইসিস ঘটায়। এদেরকে বলা হয় *labilizer*।

চিত্র ১.৯ : লাইসোসোমের গঠন।

রাসায়নিক গঠন : লাইসোসোমের আবরণী ঝিল্লি লিপো-প্রোটিন নির্মিত। ঝিল্লি দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় এতে প্রায় ৪০/৫০ ধরনের এনজাইম থাকে। উল্লেখযোগ্য এনজাইমগুলো হলো DNAase, RNAase, অ্যাসিড লাইপেজ, এস্টারেজ, স্যাকারেজ, লাইসোজাইম ইত্যাদি।

লাইসোসোমের কাজ : লাইসোসোমের এনজাইমসমূহ অম্লীয় পরিবেশে কর্মক্ষম হয়; সাইটোপ্লাজমের নিউট্রাল pH-এ এরা কর্মক্ষম থাকে না; তাই কোষের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। প্রয়োজনের সময় সাইটোপ্লাজম থেকে প্রোটন (H^+) এনে অম্লীয় পরিবেশ তৈরি করে এরা কাজ করে। এদের কাজ হলো-(i) এরা ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে। (ii) বিগলনকারী এনজাইমসমূহকে আবদ্ধ করে রেখে এটি কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুকে রক্ষা করে। (iii) লাইসোসোম অন্তঃকোষীয় পরিপাক কাজে সাহায্য করে। (iv) তীব্র খাদ্যাভাবের সময় এর প্রাচীর ফেটে যায় এবং আবদ্ধকৃত এনজাইম বের হয়ে কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুগুলো বিনষ্ট করে দেয়। এ কাজকে বলে স্ব-গ্রাস বা অটোফ্যাগী (autophagy)। এভাবে সমস্ত কোষটিও পরিপাক হয়ে যেতে পারে। একে বলা হয় অটোলাইসিস (autolysis)। (v) এরা জীবদেহের অকেজো কোষসমূহকে অটোলাইসিস পদ্ধতিতে ধ্বংস করে বলে এদের আত্মঘাতী থলিকা বা স্কোয়াড (Suicidal bag or squad) বলা হয়। (vi) কোষ বিভাজনকালে এরা কোষীয় ও নিউক্লীয় আবরণী ভাঙ্গতে সাহায্য করে। (vii) এরা কোষে কেরাটিন প্রস্তুত করে। (viii) ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। (ix) টিস্যু বিগলনকারী অ্যাসিড ফসফেটেজ এনজাইম থাকে।

রাইবোসোম ও লাইসোসোমের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	রাইবোসোম	লাইসোসোম
১। আবরণ	কোনো আবরণী দিয়ে এটি আবৃত নয়।	আবরণী দিয়ে এটি আবৃত থাকে।
২। অবস্থান	এরা বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুর গায়ে লাগানো বা সাইটোপ্লাজমে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে।	কোষের সাইটোপ্লাজমে সর্বত্র প্রায় সমানভাবে সাজানো থাকে।
৩। গঠন	এটি RNA ও হিস্টোন প্রোটিন দিয়ে গঠিত থাকে।	এতে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম বিদ্যমান থাকে।
৪। খণ্ডায়ন	এটি দুটি অসমান খণ্ডে বিভক্ত থাকে।	এটি অখণ্ডিত থাকে।
৫। কাজ	প্রোটিন সংশ্লেষে বিশেষ ভূমিকা রাখে।	এটি আন্তঃকোষীয় পরিপাকে সহায়তা করে।

৪। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum)

পরিণত কোষে সাইটোপ্লাজমে যে জালিকা বিন্যাস দেখা যায় তাই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বা অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা।

আবিষ্কার : বিজ্ঞানী পোর্টার (Keith R. Porter) এবং তাঁর সঙ্গীরা (Claude & Fullam) ১৯৪৫ সালে সর্বপ্রথম যকৃত কোষে এটি আবিষ্কার করেন। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নামকরণ করেন ১৯৫৩ সালে। অ্যালবার্ট ক্লড (Albert Claude) এবং কেইথ পোর্টার মুরগীর ভ্রূণীয় কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে আবিষ্কার করেন।

উৎপত্তি : সাইটোপ্লাজমীয় ঝিল্লি, নিউক্লীয় ঝিল্লি অথবা কোষঝিল্লি হতে এদের উৎপত্তি হয়।

বিস্তৃতি : অধিকাংশ ইউক্যারিয়টিক কোষেই এ অঙ্গাণু পাওয়া যায়। তবে বেশি থাকে যকৃত, অগ্ন্যাশয় ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কোষে।

প্রকার : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দু'প্রকার- মসৃণ এবং অমসৃণ। রেটিকুলামের গায়ে রাইবোসোম থাকলে তা অমসৃণ বা দানাদার (প্রোটিন ও এনজাইম সংশ্লেষণ) হয়, রাইবোসোম না থাকলে মসৃণ বা অদানাদার (লিপিড ও হরমোন সংশ্লেষণ) হয়।

ভৌত গঠন : গঠনগতভাবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তিন প্রকার; যথা-

(ক) সিস্টার্নি (Cisternae) : এরা দেখতে অনেকটা চ্যাপ্টা, শাখাবিহীন ও লম্বা চৌবাচ্চার মতো এবং সাইটোপ্লাজমে পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। এগুলোর ব্যাস ৪০-৫০ মিলিমাইক্রন (mμ) পুরু। এগুলোর গায়ে অনেক সময় রাইবোসোম যুক্ত থাকে।

(খ) ভেসিকল (Vesicles) : এগুলো বর্তুলাকার ফোস্কার মতো। ২৫-৫০ মিলিমাইক্রন ব্যাসযুক্ত।

(গ) টিউবিউল (Tubules) : এগুলো নালিকার মতো, শাখান্বিত বা অশাখ। এদের ব্যাস ৫০-১৯০ মিলিমাইক্রন। এদের গায়ে সাধারণত রাইবোসোম যুক্ত থাকে না।

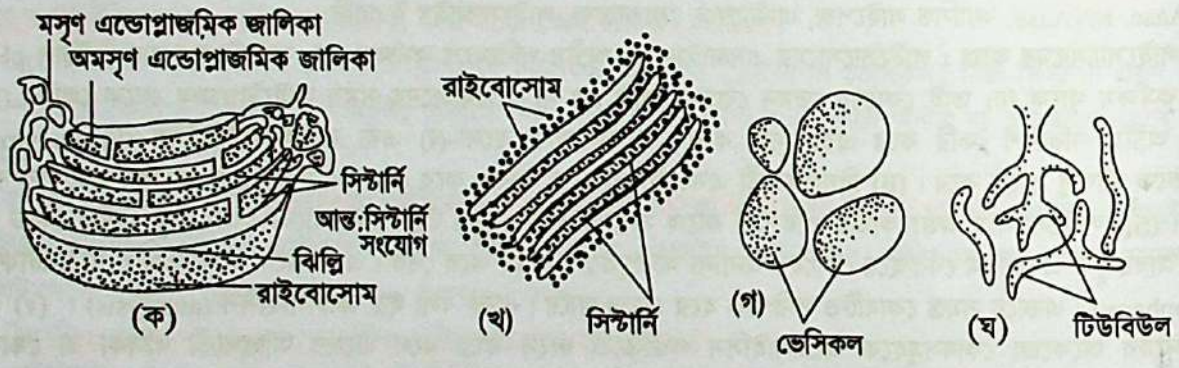

চিত্র ১.১০ : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (ক) ত্রিমাত্রিক গঠন, (খ) অমসৃণ ঝিল্লি, (গ) মসৃণ ভেসিকল এবং (ঘ) মসৃণ টিউবিউল।

রাসায়নিক গঠন : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো- প্রোটিন (৬০-৭০ ভাগ) ও লিপিড (৩০-৪০ ভাগ)। এতে প্রায় ১৫ ধরনের এনজাইম পাওয়া যায়; যেমন-গ্লুকোজ ৬-ফসফেটেজ, সক্রিয় ATPase, NADH ডায়াফোরেজ ইত্যাদি। অমসৃণ জালিতে RNA এবং গ্লাইঅক্সিসোম নামক ক্ষুদ্রাকার কণা থাকতে পারে। অমসৃণ রেটিকুলামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশকে মাইক্রোসোম (microsome) বলে।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ : (i) এটি প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে। (ii) অমসৃণ রেটিকুলামে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। (iii) মসৃণ রেটিকুলামে (বিশেষত প্রাণী কোষে) লিপিড, মতান্তরে বিভিন্ন হরমোন, গ্লাইকোজেন, ভিটামিন, স্টেরয়েড প্রভৃতি সংশ্লেষিত হয়। (iv) এটি লিপিড ও প্রোটিনের অন্তঃবাহক হিসেবে কাজ করে। (v) অনেকের মতে এতে কোষ প্রাচীরের জন্য সেলুলোজ তৈরি করে। (vi) রাইবোসোম, গ্লাইঅক্সিসোমের ধারক হিসেবে কাজ করে। (vii) এরা কোষে অণুপ্রবেশকারী বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করে। (viii) লিপিড ও প্রোটিনের অন্তঃবাহক হিসেবে কাজ করে। (ix) রাইবোসোমে উৎপন্ন প্রোটিন পরিবহনে এটি প্রধান ভূমিকা রাখে।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও গলগি বডির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম	গলগি বডি
১। অবস্থান	সকল প্রকৃত কোষে থাকে।	সকল প্রকৃত কোষে থাকে না, প্রাণিকোষে অধিক থাকে।
২। বিস্তৃতি	কোষঝিল্লি থেকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন পর্যন্ত বিস্তৃত।	সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অবস্থান করে।
৩। মসৃণতা	আবরণী ঝিল্লি মসৃণ এবং অমসৃণ, দুই ধরনের হয়।	আবরণী ঝিল্লি মসৃণ হয়।
৪। জালিকা	সমস্ত সাইটোপ্লাজমে জালিকা সৃষ্টি করে অবস্থিত।	সাইটোপ্লাজমে কোনো জালিকা সৃষ্টি করে না।
৫। কাজ	কাঠামো গঠন ও অন্তপরিবহনের কাজ করে।	সাধারণত সংশ্লেষ ও ক্ষরণকারী কাজ করে।

অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (RER)	মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (SER)
১। অবস্থান	প্রোটিন বিপাক হয় এমন কোষে (যেমন- অগ্ন্যাশয় কোষ, মিউকাস কোষ ইত্যাদি) অবস্থান করে। এরা কখনো কখনো নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সংলগ্ন থাকে।	ফ্যাট বিপাক হয় এমন কোষে (যেমন- পেশিকোষ, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কোষ, শুক্রাশয়ের লেডিগ কোষ ইত্যাদি) অবস্থান করে। এরা কখনো কখনো প্লাজমামেমব্রেন সংলগ্ন থাকে।
২। রাইবোসোম	যুক্ত থাকে।	যুক্ত থাকে না।
৩। গঠন	প্রধান উপাদান সিস্টার্নি ও কিছু টিউবিউল।	প্রধান উপাদান টিউবিউল ও ভেসিকল।
৪। উৎপত্তি	এরা নিউক্লীয় পর্দা থেকে তৈরি হয়।	রাইবোসোম মুক্ত হয়ে RER থেকে SER সৃষ্টি হয়।
৫। কাজ	প্রধান কাজ প্রোটিন ও এনজাইম সংশ্লেষ। এছাড়া লাইসোসোম উৎপাদন ও ক্যালসিয়াম সঞ্চয় করে।	প্রধান কাজ ফ্যাট, গ্লাইকোজেন ও হরমোন সংশ্লেষ। এছাড়া স্ফেরোজোম উৎপাদন ও ক্যালসিয়াম মুক্ত করে।

৫। মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

প্রকৃত জীবকোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু হলো মাইটোকন্ড্রিয়া। কোষের যাবতীয় জৈবনিক কাজের শক্তি সরবরাহ করে বলে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের 'পাওয়ার হাউস' বা শক্তিঘর বলা হয়। এ অঙ্গাণুতে ক্রেবস্ চক্র, ফ্যাটি অ্যাসিড চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়া প্রভৃতি ঘটে থাকে। দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণী ঝিল্লি দ্বারা সীমিত সাইটোপ্লাজমস্থ যে অঙ্গাণুতে ক্রেবস্ চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি ঘটে থাকে এবং শক্তি উৎপন্ন হয় সেই অঙ্গাণুকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে।

আবিষ্কার ও নামকরণ : কলিকার (Albert Von Kolliker) ১৮৫০ সালে আলোক অণুবীক্ষণের সাহায্যে সাইটোপ্লাজমে নানা আকৃতিবিশিষ্ট এসব অঙ্গাণু আবিষ্কার করেন। **W. Fleming** (1882) কোষে সুতাকৃতির মাইটোকন্ড্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন এবং **fila** (ফিলা) নামকরণ করেন। **Altman** (1890) এদের বায়োপ্লাস্ট (bioplast) নামকরণ করেন। কার্ল বেন্ডা (Carl Benda-1897) এ অঙ্গাণুগুলোকে মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন। কোষের সাইটোপ্লাজমে এরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। কোষ আয়তনের প্রায় ২০ ভাগ হলো মাইটোকন্ড্রিয়া, [(Gk- *Mitos*= thread-সুতা এবং *chondrion* = grain-দানা; একবচন- মাইটোকন্ড্রিয়ন।]

উৎপত্তি : বিভাজনের মাধ্যমে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোষে একটিমাত্র মাইটোকন্ড্রিয়ন (বহুবচনে- মাইটোকন্ড্রিয়া) থাকলে তা কোষ বিভাজনের সাথেই বিভাজিত হয়ে থাকে।

সংখ্যা : প্রকারভেদে প্রতি কোষে এক হতে একাধিক থাকতে পারে। সাধারণত গড়ে প্রতি কোষে ৩০০ হতে ৪০০টি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। [যকৃত কোষে ১০০০ বা ততোধিক থাকে। *Amoeba*-তে আরও বেশি থাকে।]

আকৃতি : আকৃতিতে এরা বৃত্তাকার, দণ্ডাকার, তন্তুকার (সূত্রাকার), তারকাকার ও কুণ্ডলী আকার হতে পারে।

আয়তন : বৃত্তাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার ব্যাস ০.২-২.০ মাইক্রন। সূত্রাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্য ৪০ থেকে ৭০ মাইক্রন। দণ্ডাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্য ৯ মাইক্রন ও প্রস্থ ০.৫ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার ভৌত গঠন : নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে মাইটোকন্ড্রিয়া গঠিত :

১। আবরণী : প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়ন লিপোপ্রোটিন বাইলেয়ারের দুটি মেমব্রেন (ব্যবধান ৬–৮ nm) নিয়ে গঠিত। বাইরের মেমব্রেনটি খাঁজবিহীন, মূলত ভেতরের অংশসমূহকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ। বাইরের মেমব্রেন ভেদ করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র অণু এবং আয়ন ভেতরে প্রবেশ করতে পারে, আবার বের হয়ে যেতেও পারে। এতে কিছু ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন থাকে যা প্রয়োজনে সক্রিয় ট্রান্সপোর্টে সহায়তা করে। এতে কোনো ETC, ATP Synthases, ATP তৈরির এনজাইম ইত্যাদি থাকে না। এর কাজ মূলত রক্ষণাত্মক। দুটি আবরণীর মধ্যে ব্যবধান ৬-৮ nm।

২। প্রকোষ্ঠ : দুই মেমব্রেনের মাঝখানের ফাঁকা স্থানকে বলা হয় বহিস্থ কক্ষ (প্রকোষ্ঠ) বা আন্তঃমেমব্রেন ফাঁক এবং ভেতরের মেমব্রেন দিয়ে আবদ্ধ কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ কক্ষ। অভ্যন্তরীণ কক্ষ জেলির ন্যায় ঘন সমসত্ত্ব পদার্থ বা ধাত্র দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই ধাত্র পদার্থকে **ম্যাট্রিক্স** বলে।

৩। ক্রিস্টি বা প্রবর্ধক : বাইরের মেমব্রেন সোজা কিন্তু ভেতরের মেমব্রেনটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধক সৃষ্টি করে। প্রবর্ধিত অংশকে **ক্রিস্টি (cristae)** বলে। এদের সংখ্যা ও আকৃতি বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন রকম হয়। এগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ার ধাত্রকে কতগুলো অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে। ক্রিস্টির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে অন্তঃক্রিস্টি ফাঁকা স্থান (intracristal space) বলে-যা বহিঃপ্রকোষ্ঠের সাথে সংযুক্ত।

৪। অক্সিসোম (Oxisome) : মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃআবরণীর অন্তর্গাত্রে অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য দানা লেগে থাকে। এদের অক্সিসোম বলে। অক্সিসোম বৃন্তক বা অবৃন্তক হতে পারে। বৃন্তক অক্সিসোম মস্তক, বোঁটা ও ভূমি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

৫। ATP-Synthases ও ETC : ক্রিস্টিতে স্থানে স্থানে ATP-Synthases নামক গোলাকার বস্তু আছে। এতে ATP সংশ্লেষিত হয়। এছাড়া সমস্ত ক্রিস্টিব্যাপী অনেক ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC) অবস্থিত।

৬। বৃত্তাকার DNA ও রাইবোসোম : মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব বৃত্তাকার DNA এবং রাইবোসোম (70S) রয়েছে। এটিও আদি কোষীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এরা ম্যাট্রিক্স-এ থাকে।

রাসায়নিক গঠন : মাইটোকন্ড্রিয়ার শুষ্ক ওজনের প্রায় ৬৫% প্রোটিন, ২৯% গ্লিসারাইডসমূহ, ৪% লেসিথিন ও সেফালিন এবং ২% কোলেস্টেরল। লিপিডের মধ্যে ৯০% হচ্ছে ফসফোলিপিড, বাকি ১০% ফ্যাটি অ্যাসিড, ক্যারোটিনয়েড, ভিটামিন E এবং কিছু অজৈব পদার্থ।

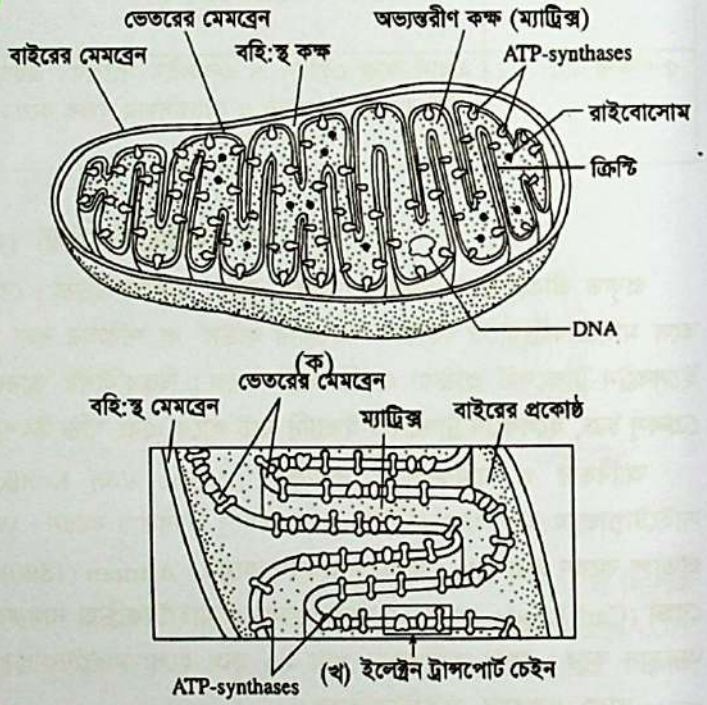

চিত্র ১.১১ : ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্যচ্ছেদ।
(ক) অর্ধাংশ ত্রিমাত্রিক, (খ) পাতলা দৈর্ঘ্যচ্ছেদ।

মাইটোকন্ড্রিয়ার ঝিল্লি লিপো-প্রোটিন সমৃদ্ধ। মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রায় ১০০ প্রকারের এনজাইম ও কো-এনজাইম রয়েছে। এছাড়া এতে ০.৫% RNA ও সামান্য DNA থাকে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ : **(i)** কোষের যাবতীয় কাজের জন্য শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ করা। **(ii)** শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম, কো-এনজাইম প্রভৃতি ধারণ করা। **(iii)** শ্বসনের বিভিন্ন পর্যায় যেমন- ক্রেবস্ চক্র, ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন সম্পন্ন করা। **(iv)** নিজস্ব DNA, RNA উৎপন্ন করা এবং বংশগতিতে ভূমিকা রাখা। **(v)** প্রোটিন সংশ্লেষ ও স্নেহ বিপাকে সাহায্য করা। **(vi)** এরা Ca, K প্রভৃতি পদার্থের সক্রিয় পরিবহনে সক্ষম। **(vii)** শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনে অংশগ্রহণ করা। **(viii)** কোষের বিভিন্ন অংশে ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+}) সঠিক ঘনত্ব রক্ষা করা। **(ix)** কোষের পূর্বনির্ধারিত মৃত্যু (apoptosis) প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা। **(x)** রক্ত কণিকা ও হরমোন উৎপাদনে সহায়তা করা। **(xi)** এভে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটায়ন, যেমন- Ca^{2+}, S^{2+}, Fe^{2+}, Mn^{2+} ইত্যাদি সঞ্চিত রাখা।

এন্ডোসিমবায়োন্ট (Endosymbiont) : ইউক্যারিয়টিক কোষে বিদ্যমান ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের এন্ডোসিমবায়োন্ট হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ধারণা করা হয় ইউক্যারিয়টিক কোষ দ্বারা এন্ডোফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ভক্ষণকৃত কিছু ব্যাক্টেরিয়া থেকে বিবর্তিত হয়ে এসব অঙ্গাণুর উৎপত্তি হয়েছে।

মাইটোকন্ড্রিয়নের বহিঃগঠন ও অন্তঃগঠনের সাথে কাজের আন্তঃসম্পর্ক

মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের মেমব্রেনটি মূলত রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালন করে। ভেতরের অংশকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ। শক্তি উৎপাদন কাজটি সংঘটিত হয় ভেতরের মেমব্রেন দ্বারা সৃষ্ট ক্রিস্টিতে। ক্রিস্টিতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের সব উপাদান সজ্জিত থাকে এবং এখানেই শক্তি উৎপন্ন হয়। কাজেই মাইটোকন্ড্রিয়ার বহিঃগঠন রক্ষণাত্মক এবং অন্তর্গঠন কর্মধায়ক। বহির্গঠন কর্মধায়ক অংশের কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্য আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

কাজ : পোস্টার পেপারে পাশাপাশি ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার চিত্র আঁকতে হবে। অঙ্কিত চিত্রে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে। চিত্রের নিচে পাশাপাশি একটি ছকে এদের মধ্যকার পার্থক্য লিখতে হবে।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, পেন্সিল, রং পেন্সিল, স্কেল, ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার চিত্র।

৬। প্লাস্টিড (Plastid)

স্ট্রোমা ও গ্রানা সমৃদ্ধ এবং লিপো-প্রোটিন ঝিল্লি দ্বারা সীমিত সাইটোপ্লাজমস্থ সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রাঙ্গের নাম প্লাস্টিড। ১৮৮৩ সালে শিম্পার (W. Schimper, 1856-1901) সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড লক্ষ্য করেন এবং এর নামকরণ করেন ক্লোরোপ্লাস্ট। পরবর্তীতে অন্যান্য প্লাস্টিড আবিষ্কৃত হয়েছে। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই এদেরকে স্পষ্ট দেখা যায়। ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল এবং প্রাণী কোষে প্লাস্টিড নেই। নীলাভ সবুজ শৈবালে প্লাজমামেমব্রেন ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে থাইলাকয়েড সৃষ্টি করে এবং থাইলাকয়েড ক্লোরোফিল ধারণ করে।

প্লাস্টিড প্রধানত তিন প্রকার; যথা- (ক) লিউকোপ্লাস্ট, (খ) ক্রোমোপ্লাস্ট এবং (গ) ক্লোরোপ্লাস্ট। প্লাস্টিডগুলোর মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) : এরা বর্ণহীন (*leucos* = বর্ণহীন)। আলোর সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্টে, বিশেষ করে ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

অবস্থান : মূল, ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড প্রভৃতি যে সব অঙ্গে সূর্যালোক পৌছায় না সে সব অঙ্গের কোষে লিউকোপ্লাস্ট অবস্থিত।

আকার-আকৃতি : লিউকোপ্লাস্ট অর্ধবৃত্তাকৃতি, মূলাকৃতি বা নলাকৃতির হতে পারে।

প্রকারভেদ : সঞ্চিত খাদ্যের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে লিউকোপ্লাস্টকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

অ্যামাইলোপ্লাস্ট (amyloplast) : স্টার্চ বা শ্বেতসার জতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে অ্যামাইলোপ্লাস্ট বলা হয়।

ইলায়োপ্লাস্ট (elaioplast) : চর্বিজাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে ইলায়োপ্লাস্ট বলা হয়।

অ্যালিউরোপ্লাস্ট (aleuroplast) : প্রোটিন সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে অ্যালিউরোপ্লাস্ট বা প্রোটিনোপ্লাস্ট বলা হয়।

কাজ : খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং শর্করা থেকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করা এদের প্রধান কাজ।

(খ) ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast) : রঙিন (*chrome* = রঙিন) প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলা হয়। ক্যারোটিন (কমলা-লাল) এবং জ্যান্থোফিল (হলুদ) পিগমেন্টের জন্যে এরা রঙিন হয়। আকৃতিতেও এরা ভিন্নতর। উদ্ভিদের যে সব অঙ্গ বর্ণময় সে সব অঙ্গে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। যেমন-ফুলের পাপড়ি, রঙিন ফল ও বীজ, গাজরের মূল ইত্যাদি। সম্ভবত ক্লোরোপ্লাস্ট হতে ক্রোমোপ্লাস্ট সৃষ্টি হয়।

কাজ : ক্রোমোপ্লাস্টের উপস্থিতির জন্য পুষ্প ও পাতা রঙিন ও সুন্দর হয় তাই কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে পরাগায়নে সাহায্য করে। রঙের কারণে ফল এবং বীজের বিস্তারেও এদের ভূমিকা আছে। এদের পৃথক খাদ্যমূল্য আছে।

(গ) ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) : সবুজ বর্ণের প্লাস্টিডকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোফিল-a, ক্লোরোফিল-b, ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিলের সমন্বয়ে ক্লোরোপ্লাস্ট গঠিত। ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণকণিকা (pigment) অধিক মাত্রায় ধারণ করে বলে এরা সবুজ বর্ণের। এতে অন্যান্য বর্ণকণিকাও কিছু কিছু পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। উদ্ভিদের জন্য

ক্লোরোপ্লাস্ট অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু। ১৮৮৩ সালে বিজ্ঞনী শিম্পার সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড লক্ষ করেন এবং নামকরণ করেন ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোপ্লাস্ট খাদ্য সংশ্লেষে সাহায্য করে বলে 'কোষের রান্নাঘর' (kitchen of cell) বা 'শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা' (factory of synthesis of sugar) বলে। এটি শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু।

প্রতি কোষে সংখ্যা : এক হতে একাধিক। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদকোষে সাধারণত ১০ হতে ৪০টি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদকোষে সাধারণত আরও কম থাকে।

আকৃতি : উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদকোষে ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি সাধারণত লেন্সের মতো হয়ে থাকে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদকোষে এদের আকৃতি হরেক রকম হতে পারে, যেমন- পেয়ালাকৃতি (*Chlamydomonas*), সর্পিলাকার (*Spirogyra*), জালিকাকার (*Oedogonium*), তারকাকার (*Zygnema*), ফিতা বা আংটি আকৃতির/গার্ডলাকৃতির (*Ulothrix*), গোলাকার (*Pithophora*) ইত্যাদি। শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্টের বৈচিত্র্য বেশি।

আকার : লেন্স আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্টের ব্যাস সাধারণত ৩-৫ মাইক্রন। *Spirogyra* এর সর্পিলাকার ক্লোরোপ্লাস্ট সোজা অবস্থায় কোষের দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি লম্বা।

উৎপত্তি : নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে পুরাতন ক্লোরোপ্লাস্টের বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ক্লোরোপ্লাস্টের উৎপত্তি হয়। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে আদি প্লাস্টিড হতে এদের উৎপত্তি হয়। আদি প্লাস্টিড ০.৫ মাইক্রন ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলাকার বস্তু। প্রতিটি আদি প্লাস্টিডে ঘন স্ট্রোমা (ধাত্র পদার্থ) একটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল সৃষ্টির সাথে সাথে আদি প্লাস্টিড পূর্ণাঙ্গ ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হতে থাকে। আদি প্লাস্টিডের দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণীর ভেতরের স্তর হতে ফোস্কা (vesicles) বের হয়ে আসে এবং ধাত্র পদার্থে সমান্তরালভাবে সজ্জিত হয়। এ ফোস্কাগুলো মিলিত হয়ে একটি ল্যামেলাম তৈরি করে। কিছু কিছু স্থানে একাধিক ল্যামেলি গ্রানাম তৈরি করে। কিছু কিছু ল্যামেলি বিভিন্ন গ্রানার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। এভাবে আদি প্লাস্টিড হতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে নতুন ক্লোরোপ্লাস্টের সৃষ্টি হয়। কিছুদিন সূর্যালোক না পেলে ক্লোরোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয়, তাই সবুজ অংশ বর্ণহীন হয়।

ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন (ভৌত গঠন) : একটি পরিণত ক্লোরোপ্লাস্ট নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১। **আবরণী ঝিল্লি :** সমস্ত ক্লোরোপ্লাস্ট একটি দুই স্তরবিশিষ্ট আংশিক অনুপ্রবেশ্য (semipermeable) মেমব্রেন (ঝিল্লি) দ্বারা আবৃত থাকে। ক্লোরোপ্লাস্ট মেমব্রেনে ফসফোলিপিড-এর পরিবর্তে গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইড (glycosyl glyceride) থাকে। এটি একটি ব্যতিক্রমী গঠন।

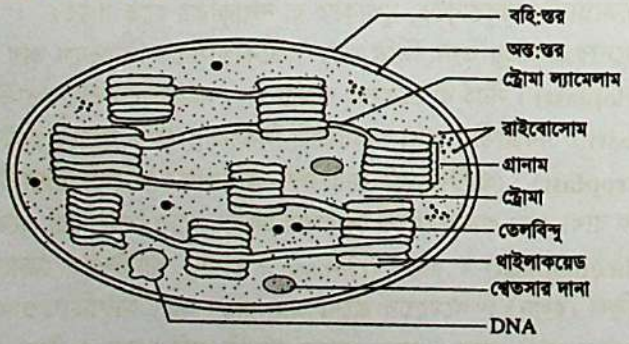

চিত্র ১.১২: ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ (সরলীকৃত)।

২। **স্ট্রোমা/ম্যাট্রিক্স :** আবরণী ঝিল্লি দ্বারা আবৃত পানিগ্রাহী, কলয়েডধর্মী ম্যাট্রিক্স তরলকে স্ট্রোমা (stroma) বলে। স্ট্রোমাতে 70S রাইবোসোম, অসমোফিলিক দানা DNA, RNA ইত্যাদি থাকে। এতে শর্করা তৈরির এনজাইমও থাকে। সালোকসংশ্লেষণে কার্বন বিজারণের মাধ্যমে শর্করা উৎপাদন প্রক্রিয়া (C_3 বা C_4 চক্র) স্ট্রোমাতে ঘটে থাকে।

৩। **থাইলাকয়েড ও গ্রানাম :** স্ট্রোমাতে অসংখ্য থলে আকৃতির 100-300 Å প্রস্থ বিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক সজ্জার গঠন বিদ্যমান। এদের থাইলাকয়েড (thylacoid) বলে। প্রত্যেকটি থাইলাকয়েডের ভেতরে একটি প্রকোষ্ঠ থাকে। এ প্রকোষ্ঠে

থাকে ক্লোরোফিল-a, ক্লোরোফিল-b, জ্যান্থোফিল, ক্যারোটিন, লিপিড ও এনজাইম। এসব বস্তুকে একত্রে স্ফটিকাকার দানার মতো দেখায়। তখন এদের কোয়ান্টোসোম বলে। কতগুলো থাইলাকয়েড একসাথে একটির ওপর আর একটি সজ্জিত হয়ে স্তূপের মতো থাকে। থাইলাকয়েডের এ স্তূপকে গ্রানাম (granum, বহুবচনে গ্রানা) বলা হয়। ১০ থেকে ১০০টি থাইলাকয়েড উপর্যুপরি সজ্জিত হয়ে একটি গ্রানাম গঠন করে। প্রতিটি ক্লোরোপ্লাস্টে সাধারণত ৪০-৬০টি গ্রানা থাকে। একটি গ্রানামের আকার ০.৩-১.৭ μm (মাইক্রোমিটার)। গ্রানাম চক্রের ঝিল্লির ভেতরের গায়ে কোয়ান্টোসোম নামক কিছু স্ফটিকার বস্তু থাকে।

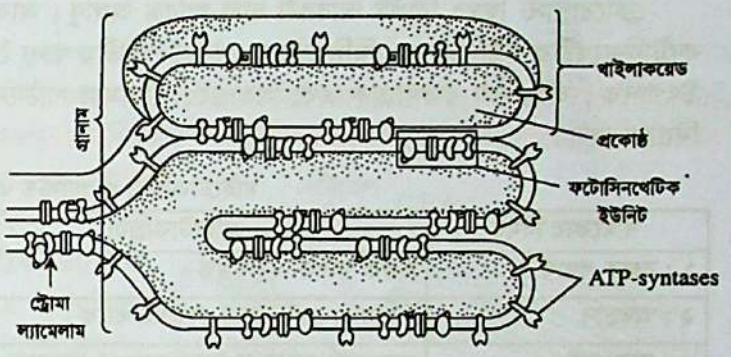

চিত্র ১.১৩ : ক্লোরোপ্লাস্ট-গ্রানামের ত্রিমাত্রিক সূক্ষ্ম গঠন।

৪। স্ট্রোমা ল্যামেলি : দুটি পাশাপাশি গ্রানার কিছু সংখ্যক থাইলাকয়েডস্ সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই সংযুক্তকারী নালিকাকে স্ট্রোমা ল্যামেলি (একবচন-ল্যামেলাম) বলে। এদের অভ্যন্তরেও কিছু পরিমাণ ক্লোরোফিল বিদ্যমান থাকে।

৫। ফটোসিনথেটিক ইউনিট ও ATP-syntases : থাইলাকয়েড মেমব্রেন বহু গোলাকার বস্তু বহন করে। থাইলাকয়েড মেমব্রেনের ভেতরের গাত্রে অসংখ্য সালোকসংশ্লেষণকারী একক ও ATP সিন্থেসেস নামক বস্তু থাকে। ATP-সিন্থেসেস নামক বস্তুতে ATP-তৈরির সকল এনজাইম থাকে। মেমব্রেনগুলোতে অসংখ্য ফটোসিনথেটিক ইউনিট থাকে। প্রতি ইউনিটে ক্লোরোফিল-এ, ক্লোরোফিল-বি, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল এর প্রায় ৩০০-৪০০টি অণু থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, মেটাল আয়ন, ফসফোলিপিড, কুইনোন, সালফোলিপিড ইত্যাদি থাকে।

৬। DNA ও রাইবোসোম : একটি ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সমআকৃতির প্রায় ২০০টি DNA অণু থাকতে পারে। ক্লোরোপ্লাস্টে তার নিজস্ব বৃত্তাকার DNA ও রাইবোসোম থাকে। এদের সাহায্যে ক্লোরোপ্লাস্ট নিজের অনুরূপ সৃষ্টি (reproduce) ও কিছু প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি বা সংশ্লেষ করতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা কোনো আদিকোষীয় DNA ও রাইবোসোম এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট প্রধানত কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন নিয়ে গঠিত। এছাড়া এতে থাকে ক্লোরোফিল। শুষ্ক ওজনের ১০–২০% লিপিড এবং ৩৫–৫৫% প্রোটিন। প্রোটিনের মধ্যে ৮০% হচ্ছে অদ্রবণীয় যা লিপিডের সঙ্গে একত্রে ঝিল্লি নির্মাণ করে, বাকি ২০% দ্রবণীয় এবং এনজাইম হিসেবে থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের রয়েছে ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণকণিকা। ক্লোরোপ্লাস্টে ৭৫% ক্লোরোফিল-a ও ২৫% ক্লোরোফিল-b রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সামান্য ক্যারোটিনয়েড ও নিউক্লিক অ্যাসিড।

ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ

(i) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা ক্লোরোপ্লাস্টের প্রধান কাজ।
(ii) সৌরশক্তিকে জৈবিকশক্তিতে রূপান্তর করা এবং বায়ুর CO_2 কে কোয়ান্টোসোমে সংবন্ধন করা।
(iii) ক্লোরোপ্লাস্টের প্রয়োজনে প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করা।
(iv) ফটোফসফোরাইলেশন অর্থাৎ সূর্যালোকের সাহায্যে ADP-কে ATP-তে রূপান্তর করা।
(v) ফটোরেসপিরেশন করা।
(vi) সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্সে সাহায্য করা।

ক্লোরোপ্লাস্টের বহিঃগঠন ও অন্তঃগঠনের সাথে কাজের আন্তঃসম্পর্ক

ক্লোরোপ্লাস্ট দ্বিস্তর বিশিষ্ট আবরণী দ্বারা আবদ্ধ অঙ্গাণু। আবরণীর কাজ রক্ষণাত্মক। ভেতরে স্ট্রোমা, থাইলাকয়েড, ফটোসিনথেটিক ইউনিটসমূহ মিলিতভাবে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের অন্তঃগঠন কর্মবিধায়ক, উৎপাদক। বহিঃগঠন রক্ষণাত্মক এবং অভ্যন্তরে কাঁচামাল পাঠানো এবং অভ্যন্তর থেকে উৎপাদিত দ্রব্য বাইরে পাঠানো নিয়ন্ত্রণ করা।

মাইটোকন্ড্রিয়া ও প্লাস্টিড এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মাইটোকন্ড্রিয়া	প্লাস্টিড
১। রঞ্জক পদার্থ	রঞ্জক পদার্থ অনুপস্থিত।	বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ উপস্থিত।
২। অবস্থান	উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় কোষেই থাকে।	শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে থাকে।
৩। অন্তঃপর্দা	অন্তঃপর্দা ভেতরের দিকে অসংখ্য ভাঁজযুক্ত, এদের ক্রিস্টি বলে।	অন্তঃপর্দায় কোনো ভাঁজ থাকে না, থাইলাকয়েড বিদ্যমান।
৪। প্রকোষ্ঠ	এটি অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।	এতে কোনো প্রকোষ্ঠ নেই।
৫। কাজ	শক্তি উৎপন্ন করা এর প্রধান কাজ।	খাদ্য তৈরি করা এর প্রধান কাজ।
৬। খাদ্য সঞ্চয়	কোনো খাদ্য সঞ্চয় করে না।	লিউকোপ্লাস্ট (বর্ণহীন) খাদ্য সঞ্চয় করে।
৭। রাসায়নিক উপাদান	প্রধান রাসায়নিক উপাদান প্রোটিন, লিপিড ও নিউক্লিক অ্যাসিড।	প্রধান রাসায়নিক উপাদান প্রোটিন, লিপিড, ক্লোরোফিল ও এনজাইম।

লিউকোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্লোরোপ্লাস্ট এর তুলনামূলক পার্থক্য

	লিউকোপ্লাস্ট	ক্রোমোপ্লাস্ট	ক্লোরোপ্লাস্ট
১। বর্ণ	এরা বর্ণহীন।	এরা রঙিন।	এরা সবুজ।
২। অবস্থান	মূল, ভূনিম্নস্থ কাণ্ড প্রভৃতি যেসব অঙ্গে সূর্যের আলো পৌছায় না সেসব অঙ্গের কোষে লিউকোপ্লাস্ট থাকে।	উদ্ভিদের যেসব অঙ্গ বর্ণময় যেমন- ফুলের পাপড়ি, রঙিন ফল ও বীজ, গাজরের মূল ইত্যাদিতে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে।	উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গ যেমন- পাতা, ফুলের সবুজ বৃতি ও কচি কাণ্ডে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।
৩। রঞ্জক	এতে কোনো ধরনের পিগমেন্ট থাকে না।	এতে ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল ইত্যাদি পিগমেন্ট থাকে।	এতে ক্লোরোফিল নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে।
৪। উৎপত্তি	এরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়।	সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্ট হতে ক্রোমোপ্লাস্টে পরিণত হয়।	সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয় অর্থাৎ সবুজ অঙ্গ বর্ণহীন হয়ে যায়।
৫। কাজ	খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং শর্করা থেকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করা এর প্রধান কাজ।	ফুলের পরাগায়ন এবং ফল ও বীজ বিস্তারের জন্য কীটপতঙ্গ ও প্রাণিকুলকে আকৃষ্ট করা এর প্রধান কাজ।	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা এর প্রধান কাজ।

৭। সেন্ট্রিয়োল (Centriole)

প্রধানত প্রাণিকোষ ও কিছু সংখ্যক উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রিয়োল থাকে। এরা নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত, স্বপ্রজননক্ষমতা সম্পন্ন এবং একটি গহ্বরকে ঘিরে ৯টি গুচ্ছ প্রান্তীয় মাইক্রোটিউবিউল নির্মিত খাটো নলে গঠিত। বিজ্ঞানী **Van Benden** ১৮৮৭ সালে এটি আবিষ্কার করেন এবং জার্মান জীববিজ্ঞানী **Theodor Bovery** ১৮৮৮ সালে এদের নামকরণ করেন ও বিশদ বিবরণ দেন।

* **বিস্তৃতি :** শৈবাল, ছত্রাক, মসবর্গীয় উদ্ভিদ, ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ, নগ্নবীজী উদ্ভিদে এবং অধিকাংশ প্রাণিকোষে সেন্ট্রিয়োল থাকে। আদি কোষ, ডায়াটম, ঈস্ট ও আবৃতবীজী উদ্ভিদে এটি অনুপস্থিত। সাধারণত নিউক্লিয়াসের খুব কাছাকাছি এটি

অবস্থান করে। সেন্ট্রিয়োল জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। একজোড়া সেন্ট্রিয়োলকে একসাথে ডিপ্লোসোম (diplosome) বলে।

ভৌত গঠন : এটি নলাকার, প্রায় ০.১৫–০.২৫ μm ব্যাসবিশিষ্ট। এরা দেখতে বেলনাকার, দুই মুখ খোলা পিপার মতো। প্রতিটি সেন্ট্রিয়োল তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত; যথা- (১) প্রাচীর বা সিলিন্ডার ওয়াল (cylinder wall) (২) ত্রয়ী অণুনালিকা বা ট্রিপলেটস (triplets) এবং (৩) যোজক বা লিংকার (linkers)। এদেরকে একত্রে সেন্ট্রিয়োল বলে। সেন্ট্রিয়োল আবরণী বেষ্টিত নয় এবং এতে কোনো DNA বা RNA থাকে না। এরা প্রোটিন, লিপিড এবং ATP নিয়ে গঠিত।

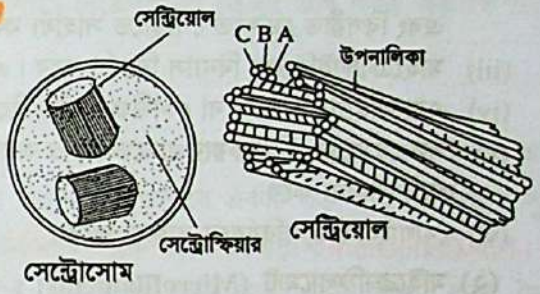

চিত্র ১.১৪ : সেন্ট্রোসোম ও সেন্ট্রিয়োল এর গঠন।

সেন্ট্রিয়োল প্রাচীর ৯টি ত্রয়ী অণুনালিকা দিয়ে গঠিত। প্রত্যেক অণুনালিকা সমদূরে অবস্থিত এবং প্রতিটি তিনটি করে উপনালিকা নিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানী Threadgold (1968) পরপর সংলগ্ন তিনটি উপনালিকাকে ভেতর থেকে বাইরের দিকে যথাক্রমে A, B ও C নামে চিহ্নিত করেন। উপনালিকাগুলো পার্শ্ববর্তী অণুনালিকার সাথে এক প্রকারের ঘন উপাদানের সাহায্যে যুক্ত থাকে। সেন্ট্রিয়োলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরল পদার্থকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার (Centrosphere) বলে। সেন্ট্রোস্ফিয়ার সেন্ট্রিয়োল ধারণ করে। সেন্ট্রোস্ফিয়ার ও সেন্ট্রিয়োলকে একত্রে সেন্ট্রোসোম (Centrosome) বলে।

রাসায়নিক গঠন : সেন্ট্রিয়োল সাধারণত প্রোটিন, লিপিড ও ATP নিয়ে গঠিত।

সেন্ট্রিয়োলের কাজ : (i) কোষ বিভাজনের সময় মাকুতন্তু গঠন করা। (ii) কোষ বিভাজনে সাহায্য করা। (iii) সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষে সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টি করা। (iv) শুক্রাণুর লেজ গঠন করা।

৮। কোষীয় কঙ্কাল (Cytoskeleton)

সকল প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলোর অন্তর্বর্তী স্থানে কতগুলো সূত্রক সম্মিলিতভাবে জালিকার ন্যায় গঠন তৈরি করে। এদেরকে কোষীয় কঙ্কাল বা সাইটোস্কেলিটন বলে। বিজ্ঞানী কোল্টজফ (Koltzoff, 1928) প্রথম সাইটোস্কেলিটন শব্দটি ব্যবহার করেন। সাধারণত প্রোটিন নির্মিত তিন ধরনের সূত্রক নিয়ে কোষীয় কঙ্কাল গঠিত। এগুলো হলো- মাইক্রোটিউবিউল্‌স, মাইক্রোফিলামেন্ট ও ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট। এরা কোষীয় চলনে এবং সেন্ট্রিয়োল, সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে।

(১) মাইক্রোটিউবিউল্‌স (Microtubules) : মাইক্রোটিউবিউল্‌স অশাখ, লম্বা ও নলাকার। এরা কোষ বিভাজন, ক্ষরণ, আন্তঃকোষীয় পরিবহন এবং ফ্ল্যাজেলা ও সিলিয়ার আন্দোলনে ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানী রবার্ট ও ফ্রাঞ্চি (Robert ও Franchi) ১৯৫৩ সালে প্রাণীর স্নায়ুকোষে মাইক্রোটিউবিউলস আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী Ledbetter এবং Porter ১৯৫৩ সালে উদ্ভিদ কোষে এদের অবস্থান প্রথম প্রত্যক্ষ করেন।

চিত্র ১.১৫ : মাইক্রোটিউবিউল্‌স-এর গঠন ও অবস্থান।

ভৌত গঠন : প্রতিটি মাইক্রোটিউবিউল্‌স দেখতে লম্বা, শাখাহীন, ফাঁপা টিউব জাতীয়। সাধারণত এদের ব্যাস ১০-২০ মিলিমাইক্রন এবং লম্বায় কয়েক মাইক্রন পর্যন্ত হয়। এদের এক প্রান্তকে '+' এবং অন্য প্রান্তকে '–' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

রাসায়নিক গঠন : প্রতিটি মাইক্রোটিউবিউল্‌সে ১৩টি প্রোটোটিউবিউল সর্পিলাকারে সজ্জিত থাকে। মাইক্রোটিউবিউল্‌সের প্রতিটি প্রোটোটিউবিউল ডাইমেরিক প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এদের প্রতিটি প্রোটিন অণু α–β (আলফা-বিটা) টিউবিউলিন (tubulin) প্রোটিন অণু দিয়ে গঠিত।

অবস্থান : এরা ফ্ল্যাজেলা, সিলিয়া ইত্যাদির উপ-গাঠনিক উপাদান হিসেবে অবস্থান করে, ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে সংযুক্ত থাকে, স্পিন্ডল ফাইবারে থাকে, সেন্ট্রিয়োল ও বেসাল বডিতে থাকে।

মাইক্রোটিউবিউল্‌স-এর কাজ :

(i) ফ্ল্যাজেলা, সিলিয়া ইত্যাদির বিচলনে সাহায্য করে।

(ii) কোষ বিভাজনের সময় মাকুযন্ত্র গঠন করে; সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোসোমকে পৃথক করতে এবং বিপরীত মেরুতে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

(iii) মাইক্রোফাইব্রিলের বিন্যাস নির্দেশ করে। এরা কোষ প্রাচীর গঠনেও সাহায্য করে।

(iv) এরা সাইটোস্কেলিটন বা কোষীয় কঙ্কাল হিসেবে কাজ করে এবং কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

(v) সেল মেমব্রেন, নিউক্লিয়ার এনভেলপ ও অন্যান্য অঙ্গাণুর সাথে সংযুক্ত থেকে এদের সাথে যোগাযোগ ও পরিবহন কার্যে সাহায্য করে।

(vi) যোগাযোগ ও পরিবহনে সাহায্য করে।

(২) মাইক্রোফিলামেন্ট (Microfilaments) : প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রোটিন দিয়ে তৈরি যেসব অতিসূক্ষ্ম সংকোচনশীল তন্তু কোষের চলনে অংশগ্রহণ করে তাদের মাইক্রোফিলামেন্ট বলে। বিজ্ঞানী প্যালেভিজ (Paleviz, 1974) প্রথম কোষে এদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন। এদেরকে অ্যাকটিন ফিলামেন্টও (actin filaments) বলা হয়। এগুলো কোষ ঝিল্লির নিচে ফিতার ন্যায় বিন্যস্ত থেকে অবস্থান করে।

গঠন : মাইক্রোফিলামেন্ট সরু, লম্বা, সংকোচনশীল ও প্যাঁচানো দ্বিতন্ত্রী। সাধারণত এদের ব্যাস 30-60Å পর্যন্ত হয়। এরা অ্যাকটিন ও মায়োসিন প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

কাজ : (i) কোষের আকৃতি দান ও যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদানে অংশগ্রহণ করে।

(ii) এরা সাইটোপ্লাজমীয় চলন, ফ্যাগোসাইটোসিস, পিনোসাইটোসিস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) এরা কোষের সাইটোকাইনেসিস ঘটিয়ে কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।

(iv) কোষীয় অঙ্গাণুর অবস্থান পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে।

(v) এরা ক্রোমোসোমের বিপরীত মেরুতে চলনে সাহায্য করে।

(৩) ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট (Intermediate filaments) : এগুলো মাইক্রোটিউবিউল্‌স ও মাইক্রোফিলামেন্টের মধ্যবর্তী এক ধরনের তন্তু। এদের আকৃতি প্রায় 10 nm (ন্যানোমিটার) ব্যাসবিশিষ্ট ফিলামেন্ট। এগুলো প্রোটিন দিয়ে গঠিত। বিভিন্ন কোষে চার ধরনের ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট পাওয়া যায়, যেমন- কেরাটিন, ল্যামিনিন, নিউরোফিলামেন্ট এবং ভাইমেন্টিন।

কাজ : (i) এরা কোষের আকৃতি দান ও যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদানে অংশগ্রহণ করে।

(ii) কোষের অন্যান্য তন্তুকে যথাস্থানে রাখতে সহায়তা করে।

৯। পারঅক্সিসোম (Peroxisome)

পারঅক্সিসোম প্রায় সব ধরনের কোষে দেখা গেলেও প্রাণীর কিডনি ও লিভার কোষে অধিক থাকে। অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের আউটপকেটিং-এর মাধ্যমে এরা তৈরি হয়। এরা এক আবরণী বিশিষ্ট, ব্যাস ০.২-১৭ μm, ভেতরে দানাদার। এর ভেতরে ক্রিস্টাল বা দানার আকারে সঞ্চয়ী এনজাইম জমা থাকে। এর মধ্যে catalase প্রধান এনজাইম। এদেরকে মাইক্রোসোম (microsome) নামেও অভিহিত করা হয়। ১৯৬৭ সালে বেলজিয়াম সাইটোলজিস্ট Christian de Duve কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে পারঅক্সিসোম অঙ্গাণুটি আবিষ্কার করেন। এই এনজাইম $2H_2O_2$ (হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড)কে $2H_2O + O_2$ (পানি ও অক্সিজেন)-এ রূপান্তরিত করে। H_2O_2 বিষতুল্য, তাই catalase এনজাইমের সাহায্যে H_2O_2 কে H_2O ও O_2 এ রূপান্তর করে কোষকে রক্ষা করে। এছাড়া কোষে অক্সিজেনের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করাও এদের কাজ। O_2 প্রয়োজনীয়, কিন্তু অধিক হলে কোষের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া কো-এনজাইম NAD

পুনঃউৎপাদনে, DNA এবং RNA এর নাইট্রোজেন ক্ষারসমূহ ভাঙতে (breakdown) এবং পুনঃউৎপাদনে (recycling) পারঅক্সিসোমের ভূমিকা আছে। পারঅক্সিসোম প্রাণীর কিডনি ও লিভার কোষে অধিক থাকে।

১০। গ্লাইঅক্সিসোম (Glyoxisome)

বীজের লিপিড সঞ্চয়ী কোষে এদেরকে দেখা যায়। এদের কাজ হলো বীজের অঙ্কুরোদগমকালে লিপিডকে ভেঙ্গে গ্রহণোপযোগী চিনিতে পরিণত করা যাতে করে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে নিজের খাদ্য তৈরির আগ পর্যন্ত অঙ্কুরিত চারার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। এরাও আবরণী বিশিষ্ট।

১১। কোষ গহ্বর (Cell Vacuole)

সাইটোপ্লাজমে দৃশ্যত যে ফাঁকা অংশ দেখা যায় তাই কোষ গহ্বর। অপরিণত কোষে এদের সংখ্যা অনেক থাকে এবং আকারে অত্যন্ত ছোট থাকে। কিন্তু পরিণত উদ্ভিদ কোষে সবগুলো গহ্বর মিলিতভাবে একটি বড় আকৃতির গহ্বর সৃষ্টি করে। প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত যে পাতলা পর্দা কোষ গহ্বরকে বেষ্টন করে থাকে তাকে টনোপ্লাস্ট (tonoplast) বলে। এ পর্দা রাবার জাতীয়। কোষ গহ্বরের অভ্যন্তরের রসকে কোষরস বলে। কোষ রসে পানি, নানা প্রকার অজৈব লবণ, জৈব অ্যাসিড, শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার রং ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে।

কাজ : (i) কোষরস ধারণ করা। (ii) প্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ ধারণ করা। (iii) এরা কোষের অভ্যন্তরের pH রক্ষা করে। (iv) এরা কোষের ভেতরের পানির চাপ রক্ষা করে।

১.৪ নিউক্লিয়াস (Nucleus)

প্রকৃত কোষে যে অঙ্গাণু দ্বিস্তরবিশিষ্ট ডবল আবরণী বেষ্টিত অবস্থায় প্রোটোপ্লাজমিক রস ও ক্রোমাটিন জালিকা ধারণ করে তাই নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে কোষের মস্তিষ্ক, প্রাণকেন্দ্র, কেন্দ্রিকা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) ১৮৩১ সালে অর্কিড (রাস্না) পত্রকোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার ও নামকরণ করেন। ল্যাটিন Nux (অর্থ nut) থেকে Nucleus শব্দের উৎপত্তি।

সংখ্যা ও বিস্তৃতি : প্রতি কোষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াস থাকে। আদি কোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না। কিছু সংখ্যক প্রকৃত কোষ, যেমন- সিভ কোষ, মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা প্রভৃতিতে পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেক কোষে একাধিক নিউক্লিয়াসও থাকতে পারে, যেমন- *Vaucheria, Botrydium, Sphaeroplea* ইত্যাদি শৈবাল ও *Penicillium* সহ কতিপয় ছত্রাক। বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এ ধরনের গঠনকে সিনোসাইট (Coenocyte) বলা হয়।

আকৃতি : নিউক্লিয়াস সাধারণত বৃত্তাকার হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপবৃত্তাকার, ফিউজিফরম (মূলাকার), প্যাঁচানো থালার মতো এবং শাখান্বিতও হতে পারে।

অবস্থান : নিউক্লিয়াস সাধারণত কোষের মাঝখানে অবস্থিত থাকে; কোষ গহ্বর বড় হলে নিউক্লিয়াসটি কিনারার দিকে অবস্থান করে।

আকার ও আয়তন : আকার ও আয়তনে এটি ছোট বড় হতে পারে। গোলাকার নিউক্লিয়াসের ব্যাস সাধারণত এক মাইক্রন। নিউক্লিয়াস কোষের ১০-১৫% স্থান দখল করে থাকতে পারে। আর, স্পার্ম বা শুক্রাণুর প্রায় ৯০%ই নিউক্লিয়াস।

নিউক্লিয়াসের কাজ : নিউক্লিয়াস কোষের সব ধরনের জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একে কোষের মস্তিষ্ক, কোষের প্রাণ বা প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। এতে ক্রোমোসোম থাকে যার দ্বারা বংশ পরম্পরায় জীবের বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায়। এরা RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে এটি মূলত নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এতে থাকে সাধারণ পানি, লিপিড, এনজাইম, DNA এবং সামান্য RNA, কিছু পরিমাণ কো-এনজাইম ও অন্যান্য উপাদান।

একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসের গঠন

নিম্নলিখিত চারটি অংশ নিয়ে একটি নিউক্লিয়াস গঠিত হয়— (ক) নিউক্লিয়ার এনভেলপ, (খ) নিউক্লিয়োপ্লাজম, (গ) নিউক্লিয়োলাস এবং (ঘ) নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু।

(ক) নিউক্লিয়ার এনভেলপ (Nuclear envelope) : নিউক্লিয়াস দু'টি দ্বিস্তরী মেমব্রেন দ্বারা আবৃত স্থান। প্রতিটি মেমব্রেন দ্বিস্তরী ফসফোলিপিড বাইলেয়ার দ্বারা গঠিত। প্লাজমামেমব্রেন এবং অধিকাংশ অঙ্গাণুর আবরণী একটি দ্বিস্তরী মেমব্রেন দ্বারা গঠিত। নিউক্লিয়াসের আবরণীকে নিউক্লিয়ার এনভেলপ বলা হয়। নিউক্লিয়ার এনভেলপে সর্বত্রই বিশেষ ধরনের অসংখ্য ছিদ্র থাকে যা অন্যান্য আবরণীতে থাকে না। নিউক্লিয়ার রন্ধ্রের ব্যাস ৯ nm. ছিদ্রের কাছে দুটি আবরণী এক সাথে মিলিত থাকে। প্রতিটি ছিদ্র সংকোচন-প্রসারণশীল। একটি প্রোটিন নেটওয়ার্ক দ্বারা এর সংকোচন-প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ছিদ্রটিকে ঘিরে চারপাশে বৃত্তাকারে প্রোটিন গ্রানিউল থাকে এবং মাঝখানে একটি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের প্রোটিন থাকে। একে ট্রান্সপোর্টার বলে। অ্যাংকর প্রোটিন দ্বারা ট্রান্সপোর্টার নিউক্লিয়ার এনভেলপের সাথে সংযুক্ত থাকে। বৃত্তাকার প্রোটিনগুলো স্পোক দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। প্রোটিন-এ সাবইউনিট ও ফাইবার থাকতে পারে। নিউক্লিয়াসের ভেতরের দিকে একটি ফাইবার খাঁচার মাধ্যমে সবগুলো প্রোটিন একসাথে ঝুলে থাকে। মোট ৮টি প্রোটিন গ্রানিউল দ্বারা ছিদ্রটি নিয়ন্ত্রিত। কেন্দ্রীয় প্রোটিনটি বিভিন্ন দ্রব্য, বিশেষ করে বড় অণু যেমন- RNA; নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইর থেকে ভেতরে পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো স্থানে নিউক্লিয়ার এনভেলপের বাইরের আবরণী অন্যকোনো অঙ্গাণুর, বিশেষ করে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে সংযুক্ত থাকে।

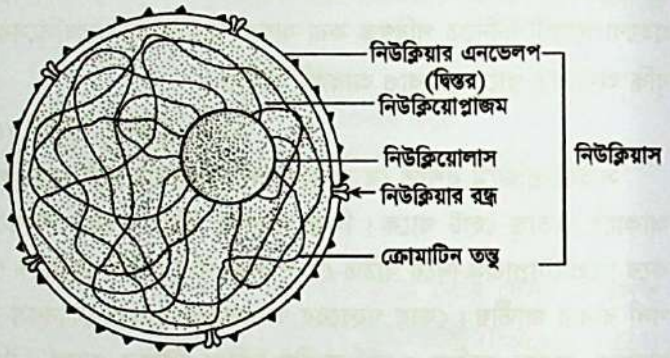

চিত্র ১.১৬ : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট নিউক্লিয়াস ও এর বিভিন্ন অংশ।

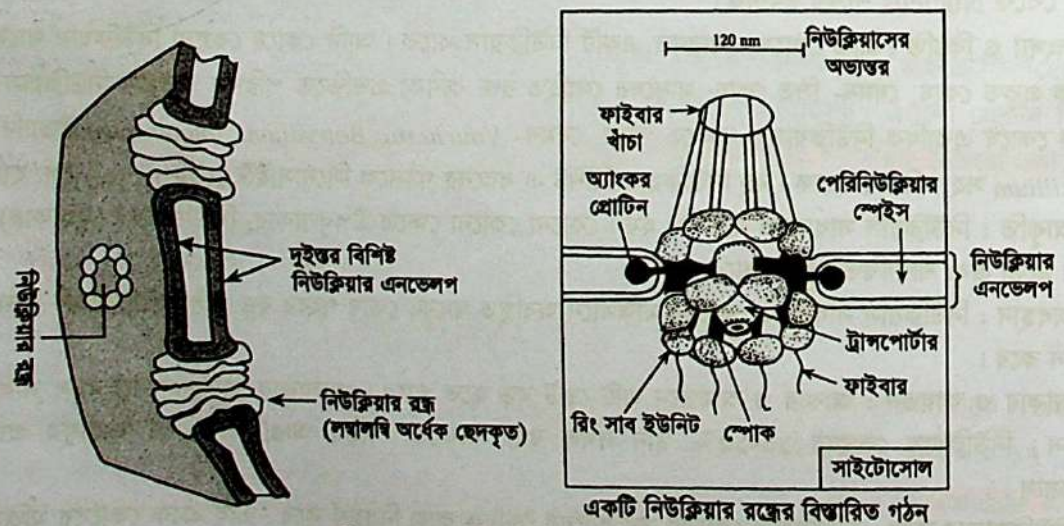

একটি নিউক্লিয়ার রন্ধ্রের বিস্তারিত গঠন

চিত্র ১.১৭ : নিউক্লিয়ার রন্ধ্রের গঠন।

নিউক্লিয়ার এনভেলপ-এর কাজ : (i) সাইটোপ্লাজম হতে নিউক্লিয়োপ্লাজম, নিউক্লিয়োলাস এবং ক্রোমাটিন জালিকাকে পৃথক করা এবং সংরক্ষণ করা। (ii) অভ্যন্তরীণ দ্রব্য ও বহিস্থ সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও পরিবহন করা।

(iii) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়াসের অবস্থানকে দৃঢ় করা। (iv) অভ্যন্তরে উৎপন্ন উপাদান রন্ধ্রের মাধ্যমে সাইটোপ্লাজমে পাঠানো।

(খ) নিউক্লিয়োপ্লাজম (Nucleoplasm) : নিউক্লিয়ার এনভেলপ দ্বারা আবৃত স্বচ্ছ, ঘন ও দানাদার তরল পদার্থই নিউক্লিয়োপ্লাজম। একে ক্যারিওলিম্ফ-ও বলে। এটি নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাজমিক রস। প্রোটোপ্লাজমের বৈশিষ্ট্যসমূহ এতে বিদ্যমান। নিউক্লিয়োলাস এবং ক্রোমোসোম এতে অবস্থান করে।

নিউক্লিয়োপ্লাজমের কাজ : (i) ক্রোমাটিন জালিকা ধারণ করা, (ii) নিউক্লিয়োলাস ধারণ করা, (iii) নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন জৈবনিক কাজে সাহায্য করা, (iv) এনজাইমের কার্যকলাপের মূল ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করা।

সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়োপ্লাজমের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সাইটোপ্লাজম	নিউক্লিয়োপ্লাজম
১। প্রধান অংশ	প্রোটোপ্লাজমের প্রধান অংশ অর্থাৎ কোষের ধাত্র বিশেষ।	নিউক্লিয়াসের প্রধান অংশ অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ধাত্র বিশেষ।
২। অবস্থান	প্লাজমামেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার এনভেলপের মাঝখানে থাকে।	নিউক্লিয়ার এনভেলপ দ্বারা আবৃত অবস্থায় নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে।
৩। নিউক্লিক অ্যাসিড	থাকে না।	থাকে।
৪। প্রোটিন ও রাইবোসোম	উপস্থিতি বেশ কম।	উপস্থিতি অনেক বেশি।
৫। শ্বসনিক এনজাইম	থাকে।	থাকে না।
৬। রঞ্জক	থাকে।	থাকে না।
৭। কাজ	কোষীয় অঙ্গাণু ধারণ করে এবং কোষীয় বিপাক ক্রিয়ার সকল কাঁচামাল সরবরাহ করে।	নিউক্লিয়োলাস ও ক্রোমাটিন ধারণ করে এবং DNA তৈরির কাঁচামাল সরবরাহ করে।

(গ) নিউক্লিয়োলাস (Nucleolus) : নিউক্লিয়াসে যে ছোট ও অধিকতর ঘন গোলাকার বস্তু দেখা যায় তাই নিউক্লিয়োলাস। বিজ্ঞানী ফন্টানা (Fontana) ১৭৮১ সালে সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে এটি দেখতে পান এবং ১৮৪০ সালে বোম্যান (Bowman) এর নামকরণ করেন।

অবস্থান : নিউক্লিয়োলাস সাধারণত নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের একটি নির্দিষ্ট স্থানে লাগানো থাকে। ক্রোমোসোমের যে স্থানটিতে এটি লাগানো থাকে সে স্থানটিকে বলা হয় SAT বা সেটেলাইট।

সংখ্যা : প্রতি নিউক্লিয়াসে সাধারণত একটি নিউক্লিয়োলাস থাকে। সাধারণত যে সব কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয় না সে সব কোষের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়োলাস থাকে না। যে সব কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ বেশি পরিমাণ হয় সে সব কোষের নিউক্লিয়াসে একাধিক নিউক্লিয়োলাস থাকতে পারে।

উৎপত্তি : SAT ক্রোমোসোমের সেটেলাইটে অবস্থিত জিন নিউক্লিয়োলাস উৎপাদনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ভৌত গঠন : এর কোনো ঝিল্লি আবিষ্কৃত হয়নি। নিউক্লিয়োলাসকে সাধারণত তন্তুময়, দানাদার ও ম্যাট্রিক্স -এ তিন অংশে ভাগ করা যায়।

রাসায়নিক গঠন : নিউক্লিয়োলাসের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো প্রোটিন, RNA এবং যৎসামান্য DNA।

নিউক্লিয়োলাসের কাজ : (i) বিভিন্ন প্রকার RNA সংশ্লেষণ করা, (ii) প্রোটিন সংশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করা, (iii) নিউক্লিয়োটাইডের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা।

নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়োলাসের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিউক্লিয়াস	নিউক্লিয়োলাস
১। অবস্থান	সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত।	নিউক্লিয়োপ্লাজমে অবস্থিত।
২। ঝিল্লি	দ্বিস্তর বিশিষ্ট ঝিল্লি দ্বারা আবদ্ধ।	কোনো ঝিল্লি দ্বারা আবদ্ধ নয়।
৩। ক্রোমাটিন জালিকা	ক্রোমাটিন জালিকা বা ক্রোমোসোম থাকে।	এতে কোনো ক্রোমাটিন জালিকা বা ক্রোমোসোম থাকে না।
৪। কাজ	কোষের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।	RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে।
৫। প্রোটিন সংশ্লেষ	প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ নেয় না।	প্রোটিন ও RNA সংশ্লেষে অংশ নেয়।
৬। বংশগতি	বংশগতির গুণাবলি বহন করে।	বংশগতির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

(ঘ) নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু (Nuclear reticulum or Chromatin fibre) : কোষের বিশ্রাম অবস্থায় (অ-বিভাজন অবস্থায়) নিউক্লিয়াসের ভেতরে জালিকার আকারে কিছু তন্তু দেখা যায়। তন্তুঘটিত এই জালিকাকে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু বলা হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনরত অবস্থায় বা পর্যায় মধ্যক অবস্থায় যে অংশ বা বস্তু ফুলজিন রং নেয় সেই বস্তুকে বলা হয় ক্রোমাটিন। প্রকৃতপক্ষে DNA এবং এর সাথে সাথী প্রোটিনের মিলিত তন্তুই ক্রোমাটিন। কোষ বিভাজন অবস্থায় ক্রোমাটিন তন্তু ক্রমাগত কুণ্ডলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা হয়ে পৃথক পৃথকভাবে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ও আকৃতিতে দৃশ্যমান হয় তখন এদেরকে **ক্রোমোসোম** বলা হয়। প্রত্যেক নিউক্লিয়াসেই সাধারণত প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কেবলমাত্র বিভাজনরত কোষেই বিশেষ রঞ্জন পদ্ধতিতে এদেরকে দেখা যায়। প্রতিটি ক্রোমোসোমে এক বা একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার, দু'টি ক্রোমাটিড এবং কোনো কোনো ক্রোমোসোমে সেটেলাইট থাকে। ক্রোমোসোমে জিন অবস্থিত এবং জিনগুলোই প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দায়ী।

রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে প্রতিটি ক্রোমোসোম DNA, RNA, হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিন দিয়ে গঠিত; এ ছাড়া কিছু ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ধাতু আছে। কতগুলো নিউক্লিয়োটাইডের সমন্বয়ে একটি DNA অণু গঠিত।

নিউক্লিয়ার রেটিকুলামের কাজ : (i) বংশগতির বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করা, **(ii)** মিউটেশন, প্রকরণ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজেও মুখ্য ভূমিকা পালন করা।

কাজ : পোস্টার পেপারে বড় করে একটি নিউক্লিয়াসের চিত্র আঁকতে হবে এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে। এবার নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়োলাসের মধ্যকার পার্থক্য একটি ছকে উপস্থাপন করতে হবে।
উপকরণ : পোস্টার-পেপার, পেন্সিল, রং পেন্সিল, স্কেল, ইত্যাদি।

কোষস্থ নির্জীব বস্তু (Ergastic substances) : কোষীয় বিপাক ক্রিয়ায় সৃষ্ট বহু নির্জীব বস্তু কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং কোষ গহ্বরে জমা হয়। নির্জীব বস্তুগুলো দ্রবীভূত অবস্থায়, ক্রিস্টাল হিসেবে, ফোঁটা বা দানাদার বস্তু হিসেবে অবস্থান করতে পারে। নির্জীব বস্তুগুলোকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : **(ক) সঞ্চিত পদার্থ, (খ) নিঃসৃত পদার্থ এবং (গ) বর্জ্য পদার্থ।**

(ক) সঞ্চিত পদার্থ (Reserve materials) : প্রধান প্রধান সঞ্চিত পদার্থগুলো হলো-শর্করা (কার্বোহাইড্রেট), আমিষ (প্রোটিন) এবং চর্বি (লিপিড)। দ্রবণীয় শর্করার মধ্যে থাকে গ্লুকোজ, চিনি, ইনুলিন। অদ্রবণীয় শর্করার মধ্যে থাকে স্টার্চগ্রেইন (শ্বেতসার দানা), সেলুলোজ এবং গ্লাইকোজেন। তৈল এবং চর্বি সাধারণত ফোঁটা ফোঁটা হিসেবে সাইটোপ্লাজমে বিরাজ করে। আমিষ তথা নাইট্রোজেনঘটিত সঞ্চিত পদার্থগুলো তরল এবং নিরেট উভয় অবস্থায় বিরাজ করে। সঞ্চিত পদার্থের অধিকাংশই সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে।

(খ) নিঃসৃত পদার্থ (Secretory products) : প্রধান প্রধান নিঃসৃত পদার্থ হলো পিগমেন্ট, এনজাইম, হরমোন এবং নেকটার। ক্লোরোফিল, এনথোসায়ানিন, ক্যারোটিনয়েড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পিগমেন্ট।

(গ) বর্জ্য পদার্থ (Excretory or waste products) : বর্জ্য পদার্থসমূহ অধিকাংশই প্রোটোপ্লাজমের মেটাবলিক কার্য প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদে বর্জ্য পদার্থ নির্গমনের পৃথক তন্ত্র না থাকায় এরা কোষে জমা হয়। উল্লেখযোগ্য বর্জ্য পদার্থসমূহ হলো রেজিন, ট্যানিন, গাম, ল্যাটেক্স, অ্যালকালয়েড, অর্গানিক অ্যাসিড, উদ্বায়ী তেল এবং খনিজ ক্রিস্টাল। প্রধান খনিজ ক্রিস্টাল হলো ক্যালসিয়াম অক্সালেট। কখনো এরা সূঁচের মতো আকারে অবস্থান করে। তখন একে বলা হয় র‍্যাফাইড, আঙ্গুরের থোকার মতো ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ক্রিস্টালকে বলা হয় সিস্টোলিথ (cystolith)।

কাজ : চার্ট তৈরি-সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুগুলোর নাম, গঠন ও কাজ। উপকরণ : পোস্টার পেপার, রংপেন্সিল, ইরেজার ইত্যাদি। একটি বড় পোস্টার পেপারে একটি ছক কেটে বামপাশে অঙ্গাণুগুলোর নাম ও সংক্ষিপ্ত চিত্র, মাঝখানের ঘরে এদের গঠন এবং ডানপাশের ঘরে এদের কাজ লিখে একটি ছক তৈরি করতে হবে। ছকটি পাঠকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষে ঝুলাতে হবে।

জীবের বিভিন্ন কার্যক্রমে কোষের অবদান : জীবের গঠন ও কার্যের একক হলো কোষ। জীবদেহের সকল কার্যক্রম কোষভিত্তিক। গ্লাইকোলাইসিস, শ্বসন, ফটোসিনথেসিস, কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধি, প্রোটিন সিনথেসিস, এনজাইম তৈরি ইত্যাদি প্রক্রিয়ার রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ সবই কোষের সাইটোপ্লাজম বা অঙ্গাণুগুলোতে সংঘটিত হয়। জীবের সকল কার্যক্রমের আধার হলো কোষ।

ক্রোমোসোম (Chromosome)

ক্রোমোসোম নিউক্লিয়াসের অন্যতম বস্তু। প্রত্যেক নিউক্লিয়াসে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। সাধারণত একই প্রজাতির বিভিন্ন নমুনায় ক্রোমোসোম সংখ্যা একই থাকে। আদি কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস না থাকাতে তাতে কোনো সুগঠিত ক্রোমোসোম থাকে না। তবে ক্রোমোসোমের প্রধান উপাদান DNA (কতক ভাইরাসে RNA) বিদ্যমান থাকে। এদেরকে আদিক্রোমোসোম (prochromosome) বলা হয়। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিভাজনরত কোষে ক্রোমোসোম দেখা যায়। এ জন্য সাধারণত বিশেষ রঞ্জক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

কোষস্থ নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত অনুলিপন ক্ষমতাসম্পন্ন, রং ধারণকারী এবং নিউক্লিয়োপ্রোটিন দ্বারা গঠিত যে সব সূত্রাকৃতির ক্ষুদ্রাঙ্গ বংশগতীয় উপাদান, মিউটেশন, প্রকরণ প্রভৃতি কাজে ভূমিকা পালন করে তাদেরকে ক্রোমোসোম বলে। ক্রোমোসোম কখনো কখনো নিউক্লিয়াসের বাইরে সাইটোপ্লাজমেও থাকতে পারে।

আবিষ্কার : **Karl Nageli** (1842) সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোম প্রত্যক্ষ করেন। **E. Strasburger** (1875) কোষ বিভাজনের সময় সূতার মতো কিছু গঠন লক্ষ্য করেন। **Walter Flemming** (1888) এসব সূতার মতো গঠনগুলোকে ক্রোমাটিন (chromatin) নামকরণ করেন। বর্ণধারণ ক্ষমতার জন্য **W. Waldeyer** (1888) এদের ক্রোমোসোম নামকরণ করেন। গ্রিক *Chroma* অর্থ colour (বর্ণ) এবং *soma* অর্থ body (দেহ)। কাজেই ক্রোমোসোম অর্থ হলো 'রঞ্জিত দেহ' বা 'রং ধারণকারী দেহ'। কারণ এরা কতগুলো বেসিক রং ধারণ করতে পারে। **Sutton** ও **Boveri** (1902) ক্রোমোসোমকে বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের বাহক ও ধারক হিসেবে বর্ণনা করেন। **Theophilus Painter** (1921) সর্বপ্রথম মানুষের ক্রোমোসোম সংখ্যা প্রকাশ করেন।

সংখ্যা : প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে এর সংখ্যা ২ হতে ১৬০০ পর্যন্ত হতে পারে। ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদে সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্রোমোসোম পাওয়া গিয়েছে *Ophioglossum reticulatum*, ১২০০। পুষ্পক উদ্ভিদে সর্বনিম্ন সংখ্যক ক্রোমোসোম পাওয়া গিয়েছে *Haplopappus gracilis*, $2n = 4$ এবং সর্বাধিক সংখ্যক *Poa littarosa*, $2n = 506 - 530$। প্রাণীতে সর্বনিম্ন $2n = 2$ (গোলকৃমি = *Ascaris megalocephalus* sub. sp. *univalens*) এবং সর্বাধিক $2n = 1600$ (রেডিওলারিয়া জাতীয় প্রোটোজোয়া = *Aulacantha* sp. এ)। মানুষের 2n ক্রোমোসোম সংখ্যা ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি। এর মধ্যে ২টি সেক্স ক্রোমোসোম ও ৪৪টি অটোসোম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এখনো সমস্ত জীবজগতের ১০ ভাগও ক্রোমোসোম গণনা করা হয়নি। উচ্চতর জীবে সাধারণত প্রতি দেহকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা ২ হতে ৮০-এর মধ্যে থাকে।

নিচে কয়েকটি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামসহ ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোসোম সংখ্যা উল্লেখ করা হলো—

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা (2n)	প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা (2n)
ধান	*Oryza sativa*	24	মানুষ	*Homo sapiens*	46
গম	*Triticum aestivum*	42	গরু	*Boss indica*	60
ভুট্টা	*Zea mays*	20	ছাগল	*Capra hircus*	60
পিঁয়াজ	*Allium cepa*	16	কবুতর	*Columba livia*	80
শসা	*Cucumis sativus*	14	সোনাব্যাঙ	*Rana pipiens*	26
গোল আলু	*Solanum tuberosum*	48	খরগোশ	*Oryctolagus cuniculus*	44
টমেটো	*Lycopersicon esculentum*	24	গরিলা	*Gorilla gorilla*	48
তামাক	*Nicotiana tabacum*	28	গিনিপিগ	*Cavia porcellus*	64
পেঁপে	*Carica papaya*	18	গৃহমাছি	*Musca domestica*	12
বাঁধাকপি	*Brassica oleracea*	18	ফলের মাছি	*Drosophila melanogaster*	08
পাট	*Corchorus capsularis*	14	কিউলেক্স মশা	*Culex pipiens*	06
মূলা	*Raphanus sativus*	18	গোলকৃমি	*Ascaris megalocephalus*	2
চীনাবাদাম	*Arachis hypogaea*	40	রেশম পোকা	*Bombyx mori*	46
যব	*Hordeum vulgare*	14	ইঁদুর	*Mus musculus*	40
কলা	*Musa paradisiaca*	44	হাইড্রা	*Hydra vulgaris*	32

আয়তন ও আকৃতি : সাধারণত প্রতিটি প্রজাতির জীবে ক্রোমোসোমের একটি সুনির্দিষ্ট আয়তন থাকে। প্রজাতি অনুসারে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩.৫—৩০ মাইক্রোমিটার এবং ব্যাস ০.২-২.০ মাইক্রোমিটার হয়ে থাকে। মানবদেহের ক্রোমোসোমের গড় দৈর্ঘ্য ৪-৬ মাইক্রোমিটার। *Drosophila* মাছির ৩ মাইক্রোমিটার ও ভুট্টার ৮-১২ মাইক্রোমিটার।

অবস্থান : নিউক্লিয়াসে।

ক্রোমোসোমের ভৌত গঠন

কোষে স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রোমোসোম পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় এগুলো অত্যন্ত সুগঠিত থাকে এবং পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। জটিল (যৌগিক) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রোমোসোমের নিম্নলিখিত অংশগুলো লক্ষ্য করা যায়।

১। ক্রোমাটিন (Chromatin) : ক্রোমোসোমের মূল উপাদান হলো ক্রোমাটিন (রঞ্জিত সূত্রাকার দেহ) যা প্রকৃতপক্ষে DNA প্রোটিন যৌগ। প্রাথমিকভাবে নিউক্লিয়োপ্রোটিন যৌগের সূত্রটি 11 nm পুরু যা ক্রমান্বয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে 30 nm, 300 nm এবং শেষ পর্যায়ে 700 nm পুরু ক্রোমাটিনে পরিণত হয় (মানুষের একটি ক্রোমোসোমে DNA ১০,০০০ গুণ খাটো হতে দেখা যায়।)। হিস্টোন প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় DNAকে বলা হয় নিউক্লিয়োসোম। Heitz (1928) ক্রোমাটিন তন্তুকে দু'ভাগে ভাগ করেন। রঞ্জক ধারণের ভিত্তিতে ক্রোমাটিন পদার্থকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা- হেটেরোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিন।

ইন্টারফেজ ও প্রোফেজ পর্যায়ে ক্রোমাটিনের যে অংশ অধিক কুণ্ডলিত ও নিষ্ক্রিয় DNA ধারণ করে থাকে তাকে হেটেরোক্রোমাটিন বলে। এরা mRNA সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে না। ক্রোমাটিনের যে অংশ কম কুণ্ডলিত ও সক্রিয় DNA ধারণ করে তাকে ইউক্রোমাটিন বলে। এটি ক্রোমোসোমের বিস্তৃত অংশ এবং mRNA সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

২। ক্রোমাটিড (Chromatid) : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ পর্যায়ে ক্রোমোসোম প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় এবং মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোসোমকে লম্বালম্বিভাবে দুটি অংশে বিভক্ত দেখা যায় যার প্রতিটির নাম ক্রোমাটিড। প্রতিটি ক্রোমোসোমে সমান ও সমান্তরাল এক জোড়া ক্রোমাটিড থাকে। এরা সাধারণত সিস্টার ক্রোমাটিড নামে পরিচিত। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ক্রোমাটিড একটি একক DNA অণু দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানী Vejdovsky (1921) এদের ক্রোমোনেমাটা (একবচন-ক্রোমোনেমা) নামে অভিহিত করেছেন।

৩। সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere) : প্রতিটি ক্রোমোসোমে একটি অরঞ্জিত অঞ্চল থাকে। ক্রোমাটিডের এই অরঞ্জিত অঞ্চলকে বলা হয় সেন্ট্রোমিয়ার। সিস্টারক্রোমাটিড সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানটি ক্রোমোসোমে একটি খাঁজ-এর সৃষ্টি করে। এই খাঁজকে বলা হয় মুখ্যকুঞ্চন বা Primary constriction। আদর্শ ক্রোমোসোমে একটি মাত্র সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। অস্বাভাবিক অবস্থায় একটি ক্রোমোসোমে ২টি বা অধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকতে পারে, আবার একটিও না থাকতে পারে।

৪। বাহু (Arm) : সেন্ট্রোমিয়ার-এর দুপাশের ক্রোমোসোমাল অংশকে বাহু বলা হয়। প্রতিটি ক্রোমোসোমের দুটি বাহু থাকে। বাহু দুটি সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বা অসম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হতে পারে। ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বাহু দুটির দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট হয়।

৫। কাইনেটোকোর (Kinetochore) : প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ারে একটি ছোট গাঠনিক অবকাঠামো থাকে যাকে কাইনেটোকোর বলে। কাইনেটোকোর-এ মাইক্রোটিউবিউল সংযুক্ত হয়।

৬। ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) : মায়োটিক প্রোফেজ-এর সূচনালগ্নে ক্রোমোসোমের দেহে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা দেখা যায় সেগুলো ক্রোমোমিয়ার নামে পরিচিত। মায়োসিসের প্রথম প্রোফেজের প্যাকাইটিন উপদশায় ক্রোমোমিয়ারের সংখ্যা ও অবস্থান স্পষ্ট দেখা যায়। অন্য নাম idiomere.

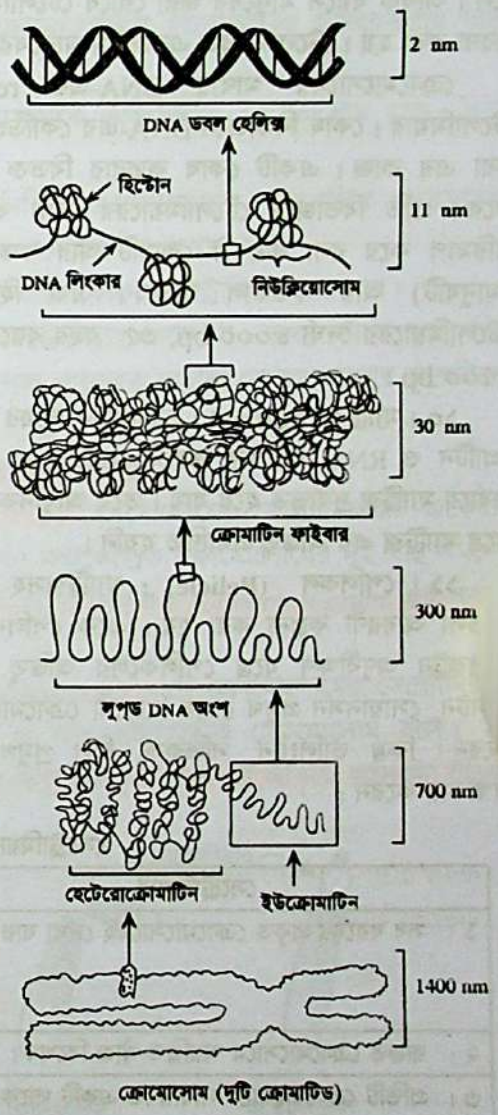

চিত্র ১.১৮ : ক্রোমোসোমের বিস্তারিত গঠন।

৭। গৌণকুঞ্চন (Secondary constriction) : সেন্ট্রোমিয়ার নামক মুখ্যকুঞ্চন ছাড়াও কোনো কোনো ক্রোমোসোমের বাহুতে এক বা একাধিক গৌণকুঞ্চন থাকতে পারে। গৌণকুঞ্চনকে 'নিউক্লিয়োলাস পুনর্গঠন অঞ্চল' নামেও অভিহিত করা হয়।

৮। স্যাটেলাইট (Satellite) : কোনো কোনো ক্রোমোসোমের এক বাহুর প্রান্তে ক্রোমাটিন সূত্র দ্বারা সংযুক্ত প্রায় গোলাকৃতির একটি অংশ দেখা যায়। ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকের এ গোলাকৃতি অঞ্চলকে স্যাটেলাইট এবং এ ধরনের ক্রোমোসোমকে 'স্যাট ক্রোমোসোম' (sat chromosome) বলে। অন্যভাবে নিউক্লিয়োলাস বহনকারী ক্রোমোসোমকে SAT ক্রোমোসোম বলে। তুলা, পাট, ছোলা ইত্যাদি উদ্ভিদে কোনো কোনো ক্রোমোসোমে স্যাটেলাইট আছে। ছোলার ১নং ক্রোমোসোমে স্যাটেলাইট থাকে। SAT নামক সেকেন্ডারি কুঞ্চন নিউক্লিয়োলাস গঠনে সাহায্য করে।

৯। টেলোমিয়ার (Telomere) : বিজ্ঞানী এইচ. জে. মুলার (H.J. Muller)-এর মতে ক্রোমোসোমের উভয় প্রান্তের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলকে টেলোমিয়ার বলে। অধিক বয়সে মানুষের জরা রোধে টেলোমিয়ার বিশেষ ভূমিকা রাখে বলে ধারণা করা হয়। টেলোমারেজ এনজাইম মানুষের জরা রোধে কাজ করে।

ক্রোমোসোমের মাথায় DNA-এর repeated sequence হলো টেলোমিয়ার। কোষ বিভাজনে DNA-এর কোডিং অঞ্চলকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে রক্ষা করা এর কাজ। একটি কোষ কতবার বিভক্ত হবে টেলোমিয়ার তা নির্ধারণ করে। প্রতি বিভাজনে টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য কমতে থাকে, তাই এর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে বলা যায় ঐ কোষটি আর কতবার বিভক্ত হবে এবং জীবটি (মানুষটি) আর কতকাল বাঁচবে। এক হিসেবে দেখা যায় জন্মকালে টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য ৮০০০ bp, ৩৫ বছর বয়সে ৩০০০ bp, ৬৫ বছর বয়সে ১৫০০ bp।

১০। ম্যাট্রিক্স (Matrix) : ক্রোমাটিন সূত্রের চারদিকে পেলিকল দ্বারা আবৃত প্রোটিন ও RNA পদার্থের স্তরকে ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা বলে। কোষ বিভাজন পর্যায়ে ম্যাট্রিক্স দ্রবীভূত হয়ে যায়। তবে আধুনিক গবেষণায় ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ম্যাট্রিক্স এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি।

১১। পেলিকল (Pelicle) : ম্যাট্রিক্সসহ ক্রোমোসোমের বাইরে একটি পাতলা আবরণী কল্পনা করা হয়। একে পেলিকল বলে। আধুনিক গবেষণায় ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পেলিকলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। তবে ম্যাক ক্লিনটন, সোয়ানসন প্রমুখ কোষ বিজ্ঞানী ক্রোমোসোমে পেলিকলের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু ডার্লিংটন, নভিকফ, রিস প্রমুখ বিজ্ঞানী পেলিকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

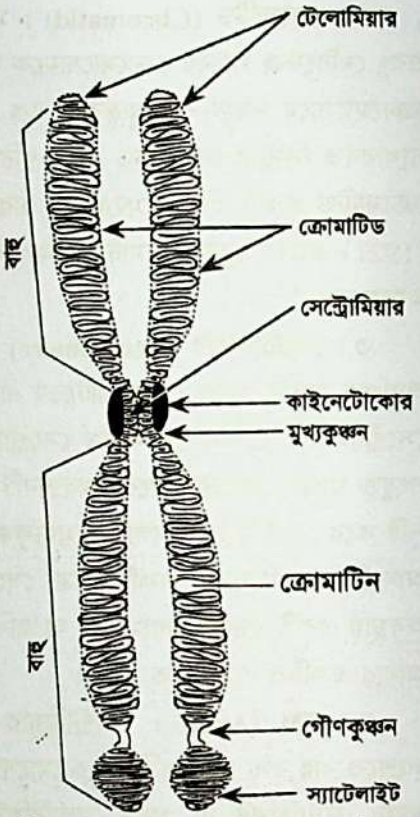

চিত্র ১.১৯ : ক্রোমোসোমের স্থূল গঠন।

সেন্ট্রোমিয়ার ও ক্রোমোমিয়ার-এর মধ্যে পার্থক্য

সেন্ট্রোমিয়ার	ক্রোমোমিয়ার
১। সব ধরনের প্রকৃত ক্রোমোসোমেই দেখা যায়।	১। সাধারণত প্রকৃত কোষের মাইটোসিস ক্রোমোসোমে দেখা যায় না, মায়োসিস প্রোফেজ-১ পর্যায়ে (লেপ্টোটিন) দেখা যায়।
২। রঞ্জিত ক্রোমোসোমে অরঞ্জিত খাঁজ বিশেষ।	২। এরা ক্রোমোসোমে (ডার্ক ব্যান্ড হিসেবে) অবস্থিত।
৩। প্রতিটি ক্রোমোসোমে সাধারণত একটি থাকে।	৩। প্রতিটি ক্রোমোসোমে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত এবং অসংখ্য থাকে।
৪। RNA অল্প কুণ্ডলিত থাকে।	৪। DNA অধিক কুণ্ডলিত থাকে, ফলে দানার মতো দেখায়।
৫। সেন্ট্রোমিয়ারে সাধারণত কোনো জিন থাকে না।	৫। প্রতিটি ক্রোমোমিয়ারে এক বা একাধিক জিন থাকে।

সেন্ট্রোসোম ও সেন্ট্রোমিয়ারের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সেন্ট্রোসোম	সেন্ট্রোমিয়ার
১। অবস্থান	প্রধানত প্রাণিকোষে থাকে।	উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের ক্রোমোসোমের দুই বাহুর সংযোগস্থলে থাকে।
২। অঙ্গাণু	এটি একটি সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু।	এটি একটি নিউক্লিও বস্তু।
৩। মাকুতন্তু	মাকুতন্তু গঠনে সহায়তা করে।	মাকুতন্তুর সাথে ক্রোমোসোমকে সংযুক্ত রাখে।
৪। গঠন	RNA ও প্রোটিন দিয়ে এটি গঠিত।	DNA ও প্রোটিন দিয়ে এটি গঠিত।
৫। সেন্ট্রিয়োল	সেন্ট্রিয়োল থাকে।	সেন্ট্রিয়োল অনুপস্থিত।

ক্রোমোসোমের প্রকারভেদ (Types of Chromosome)

(ক) সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী ক্রোমোসোম নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার; যথা—

- **মনোসেন্ট্রিক (Monocentric) :** এক সেন্ট্রোমিয়ার বিশিষ্ট ক্রোমোসোমকে মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। অধিকাংশ প্রজাতিতে মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম দেখা যায়।
- **ডাইসেন্ট্রিক (Dicentric) :** দুই সেন্ট্রোমিয়ার বিশিষ্ট ক্রোমোসোমকে ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। গমের কয়েকটি প্রজাতিতে ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম দেখা যায়।
- **পলিসেন্ট্রিক (Polycentric) :** দুই এর অধিক সেন্ট্রোমিয়ার বিশিষ্ট ক্রোমোসোমকে পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। কলা গাছের (*Musa* sp) কয়েকটি প্রজাতিতে পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম দেখা যায়।
- **ডিফিউজড (Diffused) :** ক্রোমোসোমের সুনির্দিষ্ট স্থানে সুস্পষ্টভাবে কোনো সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না।
- **অ্যাসেন্ট্রিক (Acentric) :** এক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের কোনো সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না। তখন তাকে অ্যাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। কোষ বিভাজনে এরা অংশগ্রহণ করে না। সদ্য ভঙ্গুরকৃত কোনো ক্রোমোসোমের অংশবিশেষ এ ধরনের হয়।

(খ) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোম নিম্নলিখিত চার আকৃতির হয়, যথা—

(i) মধ্যকেন্দ্রিক বা মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম (Metacentric) : যে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি একেবারে মাঝখানে অবস্থিত তাকে মধ্যকেন্দ্রিক বা মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। মধ্যকেন্দ্রিক ক্রোমোসোমের দুই বাহু সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয় এবং অ্যানাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখায়। *Solanum nigrum* এর সবকটি ক্রোমোসোমই মধ্যকেন্দ্রিক। মধ্যকেন্দ্রিক আদি বৈশিষ্ট্য।

(ii) উপ-মধ্যকেন্দ্রিক বা সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম (Submetacentric) : যে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি মধ্যখান থেকে একটু এক পাশে অবস্থিত তাকে উপ-মধ্যকেন্দ্রিক বা সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। উপ-মধ্যকেন্দ্রিক ক্রোমোসোমের দুই বাহু সামান্য অসম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয় এবং অ্যানাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'L' অক্ষরের মতো দেখায়।

চিত্র ১.২০ : সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোম।

(iii) উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক বা অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম (Acrocentric) : যে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি কোনো এক প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থিত তাকে উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক বা অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক ক্রোমোসোমের এক বাহু অনেক লম্বা এবং অপর বাহু বেশ খাটো থাকে। অ্যানাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'J' অক্ষরের মতো দেখায়। একই উদ্ভিদ প্রজাতিতে একাধিক প্রকার ক্রোমোসোম থাকতে পারে; যেমন- *Typhonium trilobatum* (ঘেটকচু) এর গাঢ় পার্পল প্রকরণে ১১টি মধ্যকেন্দ্রিক, ৪টি উপ-মধ্যকেন্দ্রিক এবং ২টি উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক। এটি একটি মনোসোমিক উদ্ভিদ।

(iv) প্রান্তকেন্দ্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম (Telocentric) : যে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি একেবারে প্রান্তভাগে অবস্থিত তাকে প্রান্তকেন্দ্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। প্রান্তকেন্দ্রিক ক্রোমোসোমকে এক বাহু বিশিষ্ট মনে হয়। অ্যানাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'I' অক্ষরের মতো বা একটি দণ্ডের মতো দেখায়। উদ্ভিদে সাধারণত প্রান্তকেন্দ্রিক ক্রোমোসোম থাকে না।

(গ) দেহ গঠন ও লিঙ্গ নির্ধারণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রোমোসোম দু'ধরনের হয়, যথা-

১। অটোসোম (Autosome) : যেসব ক্রোমোসোম দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বহন করে তাদেরকে অটোসোম বলে। অটোসোমের সেটকে A চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে ২২ জোড়া অটোসোম।

২। সেক্স ক্রোমোসোম (Sex chromosome) : সেক্স ক্রোমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। সেক্স ক্রোমোসোম দু'প্রকার; যথা- X ও Y। মানুষের একজোড়া সেক্স ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রীদেহে দুটি সেক্স ক্রেমোসোম এক প্রকার (XX) এবং পুরুষ দেহে সেক্স ক্রোমোসোম দুটি ভিন্ন ধরনের (XY) হয়। সেক্স ক্রোমোসোম লিঙ্গ নির্ধারণ ছাড়া কখনো কখনো বর্ণান্ধতা বা হিমোফিলিয়ার মতো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার বাহক হতে পারে। এ সমস্যাকে **Sex Linked Inheritance** বলা হয়।

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন বা উপাদান : ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। ক্রোমোসোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো : (১) নিউক্লিক অ্যাসিড ও (২) প্রোটিন।

(১) নিউক্লিক অ্যাসিড : ক্রোমোসোমে দু'ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়; যথা : (i) DNA ও (ii) RNA।

(i) DNA : DNA এর পুরো নাম Deoxyribo Nucleic Acid। DNA হলো প্রকৃত ক্রোমোসোমের স্থায়ী উপাদান। ক্রোমোসোমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে DNA এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ। এটি দ্বি'সূত্রবিশিষ্ট পলি নিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন। একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক। এতে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট পেন্টোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক (অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থায়ামিন ও সাইটোসিন) থাকে। বিজ্ঞানী **সুইফট** (১৯৬৪) এবং বোনার (১৯৬৮)-এর মতে ক্রোমোসোমে DNA ও হিস্টোন প্রোটিনের অনুপাত হচ্ছে ১ ঃ ১। জীবের প্রায় ৯০ ভাগ DNA ক্রোমোসোমে থাকে।

(ii) RNA : RNA এর পুরো নাম Ribo Nucleic Acid। ক্রোমোসোমে RNA এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ০.২–১.৪ ভাগ। RNA ক্রোমোসোমের স্থায়ী উপাদান নয়। প্রতিটি RNA অণু সাধারণত একসূত্রবিশিষ্ট। এটি পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল ও সাইটোসিন দ্বারা গঠিত। অনেক ভাইরাস কোষে DNA এর পরিবর্তে RNA থাকে।

(২) প্রোটিন : প্রোটিন ক্রোমোসোমের মূল কাঠামো গঠনকারী রাসায়নিক উপাদান। এ কাঠামোতে নিউক্লিক অ্যাসিড বিন্যস্ত থাকে। ক্রোমোসোমে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ। ক্রোমোসোমে দু'ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায়। যথা : (i) নিম্ন আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রোটিন ও (ii) উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন অম্লীয় প্রোটিন।

(i) নিম্ন আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রোটিন : ক্রোমোসোমে প্রোটামিন অথবা হিস্টোন হিসেবে এ দুটি ক্ষারীয় প্রোটিনের মধ্যে যে কোনো একটিকে পাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগ ক্রোমোসোমে **হিস্টোন প্রোটিন** থাকে। প্রোটামিন পাওয়া যায় শুধু শুক্রাণুর ক্রোমোসোমে। ক্রোমোসোমে হিস্টোনের পরিমাণ DNA এর পরিমাণের কাছাকাছি থাকে।

কতক প্রোটিন DNA অণুর সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। এসব প্রোটিনের আর্জিনিন, লাইসিন, হিস্টিডিন ইত্যাদির ধনাত্মক (Positively charged) সাইড গ্রুপের সাথে DNA অণুর ঋণাত্মক (negatively charged) ফসফেট গ্রুপের বন্ড তৈরি করে। অন্যান্য প্রোটিন DNA-এর বাউন্ড প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত থাকে।

(ii) উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রোটিন : ক্রোমোসোমে বেশ কয়েক ধরনের অম্লীয় প্রোটিন থাকে। উল্লেখযোগ্য হলো DNA পলিমারেজ ও RNA পলিমারেজ।

উল্লিখিত উপাদান ছাড়াও ক্রোমোসোমে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লিপিড, এনজাইম, আয়রন এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে থাকে।

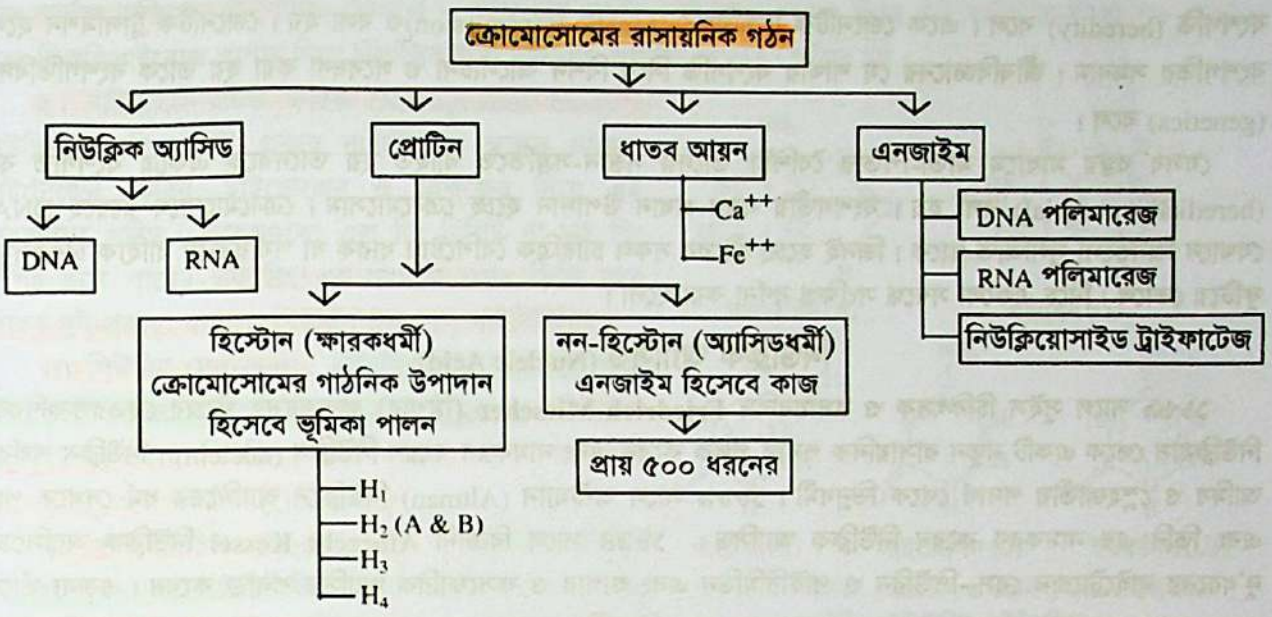

ক্রোমোসোমের কাজ : (১) ক্রোমোসোম বংশগতির ধারক ও বাহক, তাই বংশপরম্পরায় জীবের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, বহন করে এবং স্থানান্তর করে। (২) বিভক্তির মাধ্যমে ক্রোমোসোম কোষ বিভাজনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। (৩) DNA বা জিন অণু ধারণ করে। (৪) DNA-এর ছাঁচ অনুযায়ী তৈরি mRNA এর মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষণ করা। (৫) সেক্স ক্রোমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। (৬) বংশগতির বাহক জিন জীবের জীবনের ব্লু প্রিন্ট হিসেবে কাজ করে। (৭) ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনের পরিবর্তন অভিব্যক্তির মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কোষ বিভাজনে ক্রোমোসোমের ভূমিকা (The role of chromosome in the cell division)

জীবদেহের বৃদ্ধি ও জনন উভয় কাজের জন্যই কোষ বিভাজন জরুরি। কোষ বিভাজনের মুখ্য বস্তু ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমকে বাদ দিয়ে কোষ বিভাজন সম্ভব নয়। কোষ বিভাজনের শুরু এবং শেষ উভয়ই ক্রোমোসোম নির্ভর। ক্রোমোসোমে অবস্থিত DNA প্রতিলিপনের মাধ্যমে কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ ক্রোমোসোমস্থ DNA প্রতিলিপিত না হলে কোষ বিভাজন শুরু হবে না। কাজেই দেখা যায় কোষ বিভাজনে ক্রোমোসোমের ভূমিকা মুখ্য। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোষস্থ ক্রোমোসোমের প্রতিলিপন, দ্বিত্বন, বিভাজন ও মেরুকরণ সবই আবশ্যকীয় বিষয়। আবার ক্রোমোসোমবিহীন কোষ তার অস্তিত্বও রক্ষা করতে পারে না, এমনকি কোষ বিভাজনকালে ক্রোমোসোমের বণ্টন নীতিমালা বহির্ভূত হলে কোষের বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্বে বিরূপ প্রভাব পড়বে। কাজেই বলা যায়, কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় ক্রোমোসোমের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ক্রোমোসোম কতবার বিভক্ত হবে তার উপর নির্ভর করে কোষ বিভাজনের ধরন, মাইটোসিস না মায়োসিস।

বংশগতীয় বস্তু (Genetic material)

মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততি পেয়ে থাকে। পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রেই এ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য। তাই আমরা আমের বীজ থেকে আম গাছ, কাঁঠালের বীজ থেকে কাঁঠাল গাছ, ধানের বীজ থেকে ধান গাছ, পাটের বীজ থেকে পাট গাছ হতে দেখি। এভাবেই বংশানুক্রমে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। ইংরেজি প্রবাদ 'Like father like son' অর্থাৎ 'যেমন পিতা তেমন পুত্র'। এ বিষয় নিয়ে গবেষণার প্রথম পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা ধারণা পান যে, মাতা-পিতার মিলনে প্রায় একই বৈশিষ্ট্যের সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। মাতা-পিতা হতে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান-সন্ততিতে আসার প্রক্রিয়াকে

বংশগতি (heredity) বলে। একে জেনেটিক ট্রান্সমিশন (genetic transmission)ও বলা হয়। জেনেটিক ট্রান্সমিশন হলো বংশগতির সমনাম। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বংশগতি নিয়ে বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে বংশগতিবিদ্যা (genetics) বলে।

যেসব বস্তুর মাধ্যমে মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য তাদের সন্তান-সন্ততিতে বাহিত হয় তাদেরকে একত্রে বংশগতি বস্তু (hereditary material) বলা হয়। বংশগতীয় বস্তুর প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমে রয়েছে DNA, যেখানে জিনগুলো সুসজ্জিত থাকে। জিনই হচ্ছে জীবের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক যা পর্যায়ক্রমে বাহ্যিক চরিত্রসমূহ ফুটিয়ে তোলে। নিচে এগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid)

১৮৬৯ সালে সুইস চিকিৎসক ও রসায়নবিদ **Friedrich Miescher** (মিশার) ক্ষতস্থানের পূঁজের শ্বেতরক্তকণিকার নিউক্লিয়াস থেকে একটি নতুন রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করেন এবং নামকরণ করেন নিউক্লিন (nuclein)। নিউক্লিন শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ থেকে ভিন্নধর্মী। ১৮৮৯ সালে অল্টম্যান (Altman) নিউক্লিনে অ্যাসিডের ধর্ম দেখতে পান এবং তিনি এর নামকরণ করেন নিউক্লিক অ্যাসিড। ১৮৯৪ সালে বিজ্ঞানী **Albrecht Kossel** নিউক্লিক অ্যাসিডের দু'ধরনের নাইট্রোজেন বেস–পিউরিন ও পাইরিমিডিন এবং শ্যুগার ও ফসফোরিক অ্যাসিড শনাক্ত করেন। এজন্য তাঁকে ১৯১০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজ্ঞানী **Lavine** ১৯২১ সালে DNA ও RNA নামে দু'ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড আবিষ্কার করেন।

নিউক্লিক অ্যাসিড কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস মৌল নিয়ে গঠিত। নিউক্লিক অ্যাসিডে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ১৫% এবং ফসফরাসের পরিমাণ ১০%।

জীবকোষে দু'প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। এদের একটি DNA এবং অপরটি হলো RNA। DNA সাধারণত নিউক্লিয়াসের ক্রোমাটিনে থাকে। RNA-এর শতকরা ৯০ ভাগ পাওয়া যায় সাইটোপ্লাজমে এবং বাকি ১০ ভাগ পাওয়া যায় নিউক্লিয়োলাসে।

নিউক্লিক অ্যাসিড কী? নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিয়েজ এনজাইম বা মৃদু ক্ষার দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় অসংখ্য নিউক্লিয়োটাইড। কাজেই বলা যায়, নিউক্লিয়োটাইডগুলোর পলিমার সৃষ্টির মাধ্যমে গঠিত অ্যাসিডের নাম হলো নিউক্লিক অ্যাসিড। আবার নিউক্লিয়োটাইডকে মৃদু অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে উৎপন্ন হয় নাইট্রোজেন ক্ষারক, পেন্টোজ শ্যুগার এবং ফসফোরিক অ্যাসিড। এভাবেও বলা যায়, **নিউক্লিক অ্যাসিড হলো নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক, পেন্টোজ শ্যুগার এবং ফসফোরিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত অ্যাসিড যা জীবের বংশগতির ধারাসহ সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।** এগুলো কোষের সবচেয়ে বড় রাসায়নিক অণু। নিউক্লিক অ্যাসিড বংশগতির সকল বৈশিষ্ট্য বহন করে বলে এদের মাস্টার মলিকিউল (master molecule) বলে।

নিউক্লিক অ্যাসিডের মূল উপাদান: নিউক্লিক অ্যাসিডকে হাইড্রোলাইসিসের পর নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ পাওয়া যায়।

১। পেন্টোজ শ্যুগার, ২। নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক, ৩। ফসফোরিক অ্যাসিড।

১। পেন্টোজ শ্যুগার (Pentose sugar) : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট শ্যুগার (চিনি)-কে বলা হয় পেন্টোজ শ্যুগার। নিউক্লিক অ্যাসিডে দু'ধরনের পেন্টোজ শ্যুগার থাকে। এর একটি রাইবোজ শ্যুগার এবং অন্যটি ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। RNA-তে রাইবোজ শ্যুগার এবং DNA-তে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার থাকে। পেন্টোজ শ্যুগার ফসফোরিক অ্যাসিডের সাথে অ্যাস্টার গঠনে সক্ষম। রিং স্ট্রাকচারবিশিষ্ট β-D রাইবোজ অথবা β-D ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড গঠন করে।

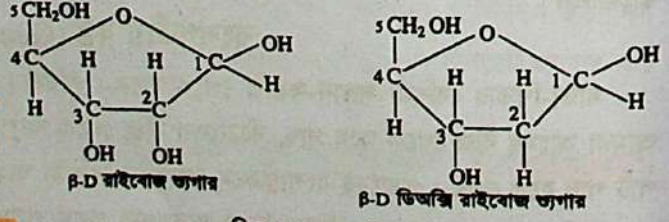

চিত্র ১.২১ : পেন্টোজ শ্যুগার।